

অধ্যায়, ২-২

শারদীয়

সাহিত্য

সংস্করণ

১৩৮৯

২



সাহিত্য সৈকত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ২ সংখ্যা ১ (পূজা ১৩৮২)

অক্টোবর '৮২-ডিসেম্বর '৮২

P 36,207

এ সংখ্যায় যা' যা' রয়েছে—

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প—মধুমতী

লেখক—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পুনর্মুদ্রণ)

ছোটগল্প নয় কবিতাও নয়—বাংলা সাহিত্যে

এক নতুন কর্ম এসে গেছে যার নাম ছোবিতা।

লিখেছেন—ধীরানন্দ রায়

এক পুলিশ অফিসারকে ঘিরে গল্প

লিখেছেন—গৌর পাল

প্রভাবিত এক তবলা বাদককে নিয়ে মর্মস্পর্শী

আর একটি ছোটগল্প লিখেছেন—কাকলি ভট্টাচার্য

সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে এসে সে

দেশের এক শ্রমিকের মানসিক একটি দিক

নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন—প্রভাত কুমার গোস্বামী

প্রচ্ছদ এঁকেছেন—কাকলি ভট্টাচার্য।

গ্রাহকদের প্রতি :—

নতুন বছরের গ্রাহক চাঁদা ৫'০০ টাকা (সডাক ৬'০০ টাকা)

পাঠিয়ে সহযোগিতা করুন।

[অনিবার্য কারণ বশত: “সাহিত্য সৈকত” এর ফুলিয়া বিষয়ক

সংখ্যা অক্টোবরের পরিবর্তে নভেম্বর '৮২-তে প্রকাশিত হবে।

মহাকবি কুস্তিবাসের ভিটে ফুলিয়ার ইতিহাস জানতে হলে সংখ্যাটি

সংগ্রহ করুন]

সম্পাদকীয়

[বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প]

“মধুমতী” যখন প্রথম ছাপা হয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের বাংলা ১২৮০-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তখন পাঠক সমাজ “মধুমতী” কে উপভাস বলেই জানতেন আর এর লেখককে কেউই প্রায় চিনতেন না। কেননা, বঙ্গদর্শনে “মধুমতী” ছাপার শেষে শুধুমাত্র লেখা ছিল “ঐ-পু”। এই “ঐ-পু” হচ্ছেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই।

পরবর্তী সময়ে “মধুমতী” গল্প হিসাবেই স্বীকৃত হয় গবেষক-পণ্ডিত কর্তৃক এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোট গল্প হিসাবেই “মধুমতী”র পরিচিতি।

তবে, ইদানীংকালের বহু পাঠকের কাছেই “মধুমতী” অপরিচিত। তাই এর পুনর্মুদ্রণ হলো বঙ্গদর্শন এর ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে।

“ছোবিতা” নামের প্রবন্ধটি আমরা আমাদের কাগজের জাল-মার্চি’৮২ সংখ্যায় ছেপেছিলাম। ছেপে বেক্রনের পর প্রবন্ধটির পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় রকমের সমালোচনাই আমাদের দপ্তরে আসে। আমাদের ঐ সংখ্যাটি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় সকল পাঠকদের দিতে পারিনি তখন। তাই, ফের ছাপতে হলো।

যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা এখানেও আমরা আহ্বান করছি পাঠকদের কাছ থেকে।

—মাধব ভট্টাচার্য

মধুমতী

কয় বৎসর পূর্বে তটপস্থায় ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিয়া আসিয়া করিতে, মহম্মদপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নীচে, মধুমতী নাম্নী তরঙ্গময়ী নদী পার হইতে হইত। তাহার নামান্তর 'এলেন খালি।'

একদা নিদাঘের প্রচণ্ড ঝটিকাবসানে রাত্রি শেষে মধুমতীর উপকূলে সেই গ্রামে একখানি শিবিকা থামিল। ডাকের বেহারারা প্রথামত, শিবিকা রাখিয়া, বশ্শিয় লইয়া, প্রস্থান করিল। ভিতর হইতে অতি সুন্দর পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় এক যুবা পুরুষ নির্গত হইয়া, ইতস্ততঃ অশ্রু বাহকদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গেলেন, এবং নিকটস্থ একখানি ভগ্ন কুটারের দ্বারে আশ্রয় করিলেন। কুটারবাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে দ্বার ঠেলে?" যুবক উত্তর করিলেন, "আমি পথিক, এই গ্রামে একদল ডাকের বেহারা থাকিবার কথা ছিল, তাহারা কোথায় বলিতে পার?" কুটারবাসী কহিল, "তাহারা রাত দশটা পর্য্যন্ত এইখানে ছিল, কিন্তু ঝড় আসাতে চলিয়া গিয়াছে।" যুবক নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর, অনন্ত নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে; এবং বিশাল তরঙ্গিণী মধুমতী হৃদয়ে ঝিকমিক করিয়া তৎপ্রতিবিম্ব নাচিতেছে। সূর্য্যোদয় নৈদাঘ বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছিল। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যোদয়; পশু, পক্ষী, গ্রামবাসী, সকলেই নীরব; কেবল কোথাও মনুষ্য পদশব্দে উত্তেজিত কুক্করের রব, আর কখন কখন অতিদূর নিঃশব্দ গ্রাম্য প্রহরীদিগের চীৎকার শ্রুতি শুনা যাইতেছিল। যুবক স্বভাবের সৌন্দর্য্য অবলোকনে অন্তরমনা হইয়া, মধুমতীর তটে পদচারণা করিতেছিলেন—হঠাৎ মৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে জলের অনতিদূরে একটা শ্বেত পদার্থ। পদার্থটি মৃত মনুষ্য দেহ। তাহার অনতিদূরে দুই একখানি ভগ্ন কাষ্ঠ ও একখানি নৌকার

হাল। বুঝিলেন, যে নিশারস্ত্রে যে প্রবল ঝটিকা হইয়াছিল, তৎকর্তৃক কোন নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল এবং এই হতভাগ্য ব্যক্তির তাহার একজন আরোহী।

যুবক রাজধানী সন্নিকটবর্তী লা গ্রামের একজন সৌষ্ঠবান্বিত ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী কায়স্থের পুত্র; তাঁহার নাম করালীপ্রসন্ন। তিনি বিশেষতঃ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজি বিজ্ঞানভ্যাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এবং তথায় যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া গৌরবের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ব বাঙ্গালায় এক প্রধান চিকিৎসকের পদে অভিষিক্ত হন। অল্প ডাকযোগে কর্মস্থানে যাইতেছিলেন। পশ্চিমধ্যে এই আড্ডায় বাহক না পাওয়াতে, এক অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

করালীপ্রসন্ন ভাবিলেন, যদি এই ব্যক্তি এই রাত্রের ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া থাকে তবে এখনও চেষ্টা করিলে, ইহাকে পুনর্জীবিত করা যাইতে পারে।

করালীপ্রসন্ন। মৃতদেহের নিকট যাইয়া, বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং দেখিলেন যে দাবিংশ বৎসর বয়স্কা পরমা সুন্দরীর দেহ। দেহ যেন পৃথিবীর রিপুবর্জিত হইয়া, স্বর্গীয় কাস্তি ধারণ করিয়াছে। এবং চন্দ্রালোকে বেগে হইল, যেন মৃত রমণীর ওষ্ঠে অপূর্ব হাসি শোভা পাইতেছে। করালীপ্রসন্ন অনেকক্ষণ অবধি অনন্ত মনে শব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। করালী অনেক সুন্দরী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল, যেন, এমনত সুন্দরী কখন তাঁহার নয়ন গোচর হই নাই। করালী নিঃসঙ্কোচে মৃত রমণীর দেহস্পর্শ করিলেন; এবং তাঁহার হস্তপদাদি চালনা ও অজ্ঞাত কৌশলের দ্বারা দেহ হইতে জল নির্গত করাইলেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক কোঁটা জল পর্য্যন্ত ততক্ষণ চেষ্টায় ত্রুটি করিলেন না। তৎপরে মৃতদেহ ভূমিতে রাখিয়া শিবিকা হইতে কোন দ্রব্য পদার্থ ও একখানি ফ্লাগে বস্ত্র লইয়া গেলেন। এবং ঐ বস্ত্র দ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রমণীর হস্তপদাদি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রব্য প

তাঁহার গুপ্ত ভেদ করিয়া ঢালিলেন, কিন্তু পদার্থ তৎক্ষণাৎ ছুই কশ দিয়া পড়িয়া গেল, গলাধঃকরণ হইল না। ইত্যবসরে, করালী মৃতদেহ কর্দ্দম হইতে পরিষ্কার করিয়া ঘাসের উপর রাখিলেন।

করালী ছুই ভিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই কামিনীকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলেন না। শেষে হতাশ্বাস হইয়া, শিবিকায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

সেই নদী সৈকতশায়ী অপূর্ব মহিমাবিশিষ্ট মৃত রমণীর মুখ মণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল। করালী অশ্রুদিকে মন ফিরাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না।

‘তিনি শিবিকার দ্বারোদঘাটন করিলেন এবং সহসা তাঁহার বোধ হইল, যেন নিদাঘের গ্রীষ্ম যজ্ঞণায় নৈশ সমীরণ সেবনার্থ, কোন বান্ধি চন্দ্রালোকে মধুমতীতীরে শয়ন করিয়া আছে। সেই হতভাগিনী সুন্দরী! যাহাকে প্রাসাদোপরি সুকুমার পুষ্পশয্যায় আদ্রে শয়ন করাইয়া, যত্নে ব্যঞ্জন করিয়া, মধুর সঙ্গীতে নিদ্রিত করিয়া, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বামীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না, এখন সে নদী সৈকতে, কর্দ্দমশয্যায় পড়িয়া আছে। করালী অল্প বয়স্ক, মৃত সুন্দরীর জন্য তাঁহার চক্ষে এক কোঁটা জল পড়িল। করালী অগ্রমনস্ক হইবার জন্য শিবিকার ভিতরে আলো জ্বালিয়া, একথান পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। আলো নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু, নিদ্রা কষ্ট জনক হইল। করালী নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সেই মৃত কামিনী শ্মশান শয্যা ত্যাগ করিয়া, শিবিকার দ্বারোদঘাটন পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রেমপরিপূরিত লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কি বলিতেছে। করালী চমকিয়া উঠিলেন এবং শিবিকার দ্বার খোলা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মধুমতীর তটে যেস্থলে মৃতদেহ রাখিয়াছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেস্থলে শব নাই। চকিতের স্থায় চতুর্দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কোথাও

কিছু দেখিতে পাইলেন না। যামিনী প্রায় অবসন্ন হইয়াছে। চন্দ্র অন্তর্গত প্রায়। পূর্বদিক ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে। বিহঙ্গ-মকুল কল কল রব করিয়া দিগদিগন্তে যাইতেছে। আর নদী মধুমতী উষার ঋতুর সমীরণে চঞ্চল হইয়া কল কল রব করিতেছে। করালী ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে মধুমতীর কূলের দিকে চলিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালী একবার মনে ভাবিলেন, শৃগাল কুকুরে আহার নিমিত্ত কোন বনে শব লইয়া গিয়াছে। এই স্থির করিয়া শিবিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শিবিকার নিকট আসিয়া তাঁহার আর পা উঠিল না, শরীর রোমাঞ্চ হইল, বুদ্ধি লোপ হইল। মৃত রমণী দেহ নদীকূল শয্যা ত্যাগ করিয়া, করালীর শিবিকা পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে।

করালী প্রসন্ন অনেকক্ষণ প্রস্তুতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি কেহ শব তুলিয়া এখানে ফেলিয়া গেল? না পৈশাচ ঋষ্য প্রমাণী-কৃত করিয়া শব এখানে আপনি আসিয়াছে?

স্থির বুদ্ধির নিকট কোন ভ্রম থাকে না। করালী শবের প্রকোষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া দেখিলেন জীবন স্রোতঃ বহিতেছে। নিঃশ্বাসাদি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, এ শব নহে হৃন্দরী জীবিত। কিন্তু নিদ্রিতা অথবা মূচ্ছিতা? করালী এখন বুঝিলেন, যে যুবতী তাঁহার চিকিৎসা প্রভাবে পুনর্জীবিত হইয়া শিবিকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই দ্বারা শিবিকার দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছিল। পরে তিনি ক্লান্ত হইয়া মূচ্ছিতা হইয়া থাকিবেন।

করালী ধীরে ধীরে যুবতীকে শিবিকার ভিতর শোয়াইলেন। গ্রামবাসী জনৈক ব্যক্তিকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়া, অতি দ্রুত একখানি সৈয়দপুরে পানসী ভাড়া করিলেন, বাহক আনাইয়া, পানসী সাহিত যুবতীকে নৌকায় তুলিলেন, এবং একটি কামরায় আপনি স্বয়ং শয্যা রচনা করিয়া আত্মঘেঁ রমণীকে উহাতে স্থাপিত করিয়া, অনেক কোশলে মূচ্ছাভঙ্গ করিলেন। দিনমাণর উদয় হইল, পৃথিবী জ্যোতির্ময়ী হইল, সঙ্গে সঙ্গে করালী প্রসন্নের হৃদয়

জ্যোতির্ময় হইল। যে রমণীর মৃতদেহ দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই রমণী তাঁহারই ঘড়ে পুনর্জীবিতা হইয়া, চক্ষু রুম্মালীন করিল। করালীর বোধ ছিল যে যুবতী অপরিচিত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু তাহার কিছু চিহ্ন দেখিলেন না। যুবতী চৈতন্য পাইয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। করালী তাঁহার পাথের খাড়াব্যা হইতে খাইতে দিলেন। রমণী আহার করিয়া নিজাভিভূতা হইলেন, ইত্যবসরে করালী ইতি কৰ্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যুবতী যে সধবা নহে, তাহা তিনি তাহার অলঙ্কারবিহীন হস্ত দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন। যুবতী কে, কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে বাটী পাঠাইবেন, আর কি প্রকারে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন এই সকল ভাবিতেছিলেন। এমনতর সময়ে রমণীর নিজাভঙ্গ হইল। করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কেমন আছ ?” যুবতী কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিল এবং আপনার অঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে অক্ষুট স্বরে গীতোদ্যম করিতে লাগিল। অবাস্তানাঙ্গী কলবিহঙ্গমবৎ কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, কিন্তু অর্থযুক্ত কোন বাক্য নির্গত হইল না—যেন গীত মনে পড়িল না। করালী দেখিলেন, মুখের ভাব অজ্ঞান বালিকার ন্যায়। দৃষ্টির স্থিরতা নাই। অঙ্গস্থলিত বসন সাবধান করিবার ইচ্ছা নাই। সর্বনাশ! একি পাগল! করালী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কাহার কন্যা?” রমণী বিনা বাক্যে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। “তোমার নাম কি?” তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তৎপরে কিছু খাড়া সামগ্রী লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “খাবে?” রমণী বালিকার ন্যায় হাস্য করিয়া খাড়া লইয়া আহার করিল। করালী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, একটি উন্মাদিনী তাঁহার স্বক্ষে পড়িল।

রমণীর পূর্বস্মৃতি লোপ হইয়াছে সুতরাং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি কি প্রকারে অপরিচিতা, বুদ্ধিহীন। জীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া বেড়ান।

এই সকল চিন্তায় তিনিও ক্ষিপ্ত হইলেন। করালী বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল; এবং স্থিরপ্রজিহ্বা। সহসা কোন বিষয়েই মীমাংসা করিতে ক্ষমবান ছিলেন। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন; যৌবনী বুদ্ধিহীন হউক বা বুদ্ধিমতী হউক; যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; তখন তাহাকে আশ্রয় দেওয়া কোন দোষ নাই; বরং কর্তব্য কার্য।। অতএব যৌবনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার মানসে, নিকটস্থ গ্রাম হইতে একটি দাসী আনাইয়া তাহার পরিচর্যার্থ নিযুক্ত করিলেন। করালী পুনর্জীবিতা রমণীর নামকরণ করিলেন। মধুমতী নদী তীরে তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন; অতএব তাহার নাম দিলেন “মধুমতী।”

করালী প্রসন্ন মধুমতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কর্মস্থানে গেলেন, এবং অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। মধুমতীও যেমন বালিকা মাতার অনুরক্তা হয়, সেইরূপ করালীর অনুরক্তা হইলেন। যতক্ষণ তিনি বাসায় থাকিতেন ততক্ষণ মধুমতী তাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। হয় তাহার কেতার পত্র লইয়া, নতুবা অল্প কোন দ্রব্য লইয়া, তাহার সম্মুখে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন।

এই প্রকার তিন মাস গেল। ক্রমে মধুমতীর মুখের ভাবান্তর হইতে লাগিল। যখন করালীকে দেখিতে পাইতেন, তখন বালিকা মুক্তি পরিবর্তিত হইয়া মুখমণ্ডলে যৌবনোপযোগী ভাব সঞ্চার হইতে থাকিত।

এইরূপে তাহার বুদ্ধিক্ষুধি হইতে লাগিল। যেমন বালিকাদিগের দিনে দিনে মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, ক্ষুধি হইয়া থাকে সে প্রকারে নহে। যেমন শুষ্ক পল্লব রাশি মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ফুৎকার দিলে অগ্নি একবারে প্রজ্জ্বলিত হয়, এ সেই প্রকার। অগ্ন্যস্ত্র জ্বলোকদিগের বুদ্ধির জ্বায় বুদ্ধি মধুমতী পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন না। তিনি জলমগ্ন হইবার পূর্বে কে ছিলেন তাহা আর মনে পড়িল না।

করালী একদিন পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে তাঁহাকে জলমগ্ন বস্তাস্ত সমুদয় অবগত করাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন, জলমগ্নের পূর্ববাবস্থা স্বরণ করিতে, কিন্তু মধুমতীর কিছুই স্বরণ হইল না, বরং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন কিছুই স্বরণ না হয়। যেন কিছুই স্বরণ না হয়! আর কেহ কি উদ্ভাদিনীর মত জগদীশ্বরের নিকট পূর্বস্মৃতি লোপের প্রার্থনা করে? শত সহস্র লোক। ঘাহাদের পূর্বকৃতাপরাধ ব্যাক্তোর বংশাবলীর গ্রায় শোণিতাস্ত কুন্তলদাম দোলাইয়া সর্বদাই স্মৃতিপথে বিচরণ করে, তাহারাই স্মৃতিলোপের কামনা করে। কিন্তু মধুমতী লুপ্তস্মৃতির চিরলোপের কামনা করে কেন? করালী অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন মধুমতী এখন স্থখী পাছে পূর্বস্মৃতি আসিয়া এ আনন্দের বিষ্ন করে, এই আশঙ্কা। যেমন দর্পণে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া লোকে আপন মুখ দেখে, তেমনি করালী মধুমতীর হৃদয়ে আপন হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। দেখিলেন, উভয়েই প্রেমবিমুক্ত।

পুস্তকের প্রতি বালিকার প্রেমের গ্রায়, মধুমতীর প্রেম।—

এক দণ্ডের জন্ত করালীকে না দেখিতে পাইলে, মধুমতী পাগলের গ্রায় হইত। করালীপ্রসন্ন চিকিৎসা অনুরোধে দুই এক ঘন্টা অনুপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু মধুমতী এ সময়টুকু অসীম যত্নপায় অতিবাহিত করিতেন। মধুমতী পা ছড়াইয়া বসিয়া, অবোধ বালিকার গ্রায় রোদন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন, যেন করালীপ্রসন্নের জুতার শব্দ, অথবা দরওয়াজায় গাড়ী ধামার শব্দ পাইতেন। অমনি চীৎকার করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “বামা, বাবু এলেন বুঝি?” কিন্তু যখন বামার উত্তরে বুঝিতেন, যে তাঁহার ভ্রম মাত্র, তখন আবার পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতেন।

করালীপ্রসন্ন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবাশ্রম মধুমতীর গ্রায় ভুবন মোহিনী রূপসীর সহবাসে যেমন হারাইবেন, তাহার বিচিৎ্র কি? অষ্টপৃষ্ঠে মধুমতীর প্রণয়পাশে জড়িত হইয়া অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলেন। মধুমতী জীরত্ব, কেমন করে অধিকার করিবেন, অনুদিন

তাহাই চিন্তা করিতেন। মধুমতী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা সে বিষয় সর্বদাই আন্দোলন করিতেন। মধুমতী বিধবা হইলে তাঁহার বিবাহের কোন আশঙ্কা ছিল না, কেন না তিনি ব্রাহ্ম; কিন্তু মধুমতী যে সধবা নন, সে বিষয়ে তাঁহার এক প্রকার সংশয় দূর হইয়াছিল; কেননা যখন মধুমতীকে মৃত্যুবস্থায় দেখিতে পান তখন হস্তে একখানিও গহনা ছিল না। হইতে পারে দৃশ্য কর্তৃক তাহা অপহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মধুমতীর প্রণয়াকান্ধায় তাহার মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল, সে সংশয় মনে আসিল না। করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে বিবাহ করাই স্থির করিলেন।

একদিন করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে কহিলেন, “মধুমতী”—মধুমতী তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখে কথা ফুটিল না। কোন কোন সময়ে করালীর সম্মুখে মধুমতীর কথা ফুটিত। যখন করালীপ্রসন্ন প্রদীপ অথবা দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মধুমতীর সম্মুখে বসিতেন। তখন কথা ফুটিত। মধুমতী অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেন “এই দিকে বস” কেন না করালীর মুখ অন্ধকার হওয়াতে তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না। এই দিকে বসিলে মুখ অন্ধকার ঘুচিয়া আলোকময় হইবে এবং মধুমতী তৃপ্তি পূর্বক তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। একদিন করালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, “মধুমতী, তুমি সধবা না বিধবা তাহা কিছু তোমার মনে পড়ে?”

ক. এবার মধুমতী কথা কহিল। বলিল, “বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয় বিধবা।”

ক. “আমার তাই বোধ হয়, কেন না, তোমায় যখন নদীর তীরে পাইয়াছিলাম, তখন তোমার অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না।”

ম। “তবে আমি বিধবা।” করালীর মুখ প্রফুল্ল হইল। পুনরপি বলিলেন, বিধবার বিবাহ হয় জান?”

ম। “তোমারই মুখে শুনিয়াছি।”

ক। “তুমি আবার বিবাহ করিবে?”

ম। “করিব না কেন।”

ক। “কাকে বিয়ে করবে ?”

ম। “তুমি যাকে বল।”

ক। “আমাকে ?”

মধুমতী তখন লজ্জায় মুখ নত করিয়া, মুহু মুহু স্বরে কহিল, “করিব।” করালী আর কখন মধুমতীকে লজ্জিত দেখেন নাই। করালী উঠিয়া গেলেন। মধুমতী ক্ষিপ্তার ছায়া হাসিতে ও কাঁদিতে আরম্ভ করিল সে কেবল আনন্দে।

বিবাহের দিন স্থির হইল। শুভ ক্ষণে, অশুভ ক্ষণে, তাঁহাদের বিবাহ হইল। করালী বিদায় লইয়া, মধুমতীর সহিত স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

“আর কত দিনে আমরা সেই স্থানে পৌঁছিব” মধুমতী একদিন নৌকাতে করালীপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন। করালী কহিলেন “কোন স্থানে ? যে স্থানে তোমায় কুড়াইয়া পাইয়াছি ? সে ঐ স্থান।” মধুমতী একবার সেই স্থান নিকটস্থ হইয়া দেখিতে চাহিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় মান্নিরা নৌকা অমনি কুলের দিকে ফিরাইল। মধুমতী খড়খড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ইচ্ছা করিলেন সে রাত্রি সেখানে থাকেন। স্মরণে নৌকাও তীরলগ্ন হইল। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। মধুমতী স্নেহে করালীপ্রসন্নের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন, আর করালীপ্রসন্নের হস্তময় মুখ নিদ্রার স্বপ্নে দেখিতে ছিলেন। কিন্তু সে স্নেহের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। মধুমতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। করালীও জাগিলেন। দেখিলেন যে ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা তুলিতেছে। করালী খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া মধুমতীকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। মধুমতী করালীর ভয়ের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি যে স্বামীর হৃদয়ে মাথা রাখিতে পাইলেন, সেই অসীম স্নেহেতে কাঁদিতে লাগিলেন। করালী বাহিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে অতি ভীষণ অন্ধকারে দিম্বগুল আচ্ছন্ন করিয়াছে ; প্রায় কালের ছায়া বৃষ্টি, মুহুমুহুঃ অশনি নিপাত এবং অতি প্রচণ্ড ঝড় সকলে সাহিত্য সৈকত ৫ □ পূজা—১৩০৯

একত্রিত হইয়া পৃথিবী রসাতলে দিতেছে। কিন্তু করালীপ্রসন্ন বিদ্যাতালোকে দেখিলেন, যে এই ভীষণ সময়ে উন্মথিতা নদীর বিজ্ঞন উপকূলে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। করালী কৌতূহলী হইয়া জনৈক সূচত্বর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ও কে দাঁড়াইয়া—জান?” মাঝি কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনরায় বিদ্যাৎ হানিলে সে দেখিতে পাইল এবং চমকিয়া উঠিল।

করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কে চেন?”

মাঝি। ওকে আবার চিনি না—এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লা যে এখানে ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা লাগাইয়াছে, সেই চিনিয়াছে।”

ক। “ও কে?”

মাঝি। কে তা কেউ জানে না, ও ভূত কি চোর তা কেউ জানে না, কিন্তু আজ মাস দুই তিন হইল রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময়ে এই নদী তীরে সকলেই দেখিতে পায়—

ক। তুমি কখনও দেখিয়াছিলে?

মা। মাঝি মাল্লার মধ্যে কে না দেখেছে?

আমরা কলিকাতা হইতে আসিবার সময় একদিন ঝড় বৃষ্টির রাত্রে এইখানে নৌকা রাখিয়াছিলাম। আর ওকে ঐ স্থানে দেখিয়াছিলাম।

করালী অতিশয় কৌতূহলী হইয়া কূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না বিদ্যাৎ হানিলে দেখিলেন যে দীর্ঘাকার পুরুষ অদৃশ্য হইয়াছে, পরে মাঝিকে বিদায় দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীর সহিত স্বদেশে পৌঁছিলেন। পিতা মাতা মঙ্গলাচরণ করিয়া পুত্র বধু ঘরে লইলেন এবং মধুমতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মধুমতী এবং করালীপ্রসন্নের সুখের সীমা রহিল না। এক দণ্ডের জন্ত বিচ্ছেদ নাই; করালী দিবারাত্র ঘরে থাকিতেন, এবং মধুমতী অনিবেশ লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কখন যদি এক দণ্ডের

জন্ম বিচ্ছেদ হইত তবে মধুমতী বালিকার স্নায় কঁাদিতেন।
মধুমতীর এই প্রকার ব্যবহারে পুরবাসী স্ত্রীতিবাসিগণ সকলেই
বিরক্ত হইতেন।

অকস্মাৎ এই অনন্ত স্থলের সাগর শুষ্ক হইল। যে দিনে
বিধাতার লিখনানুসারে এক অশ্বনিতে দুই জনের হৃদয় ভগ্ন হইবে
সেই দিন প্রভাত হইতে চলিল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা কি
প্রকারে বর্ণনা করিব ? তাহার আনুপূর্বক বর্ণন সম্ভব নহে।

করালীপ্রসন্ন বিশেষ কার্যোপলক্ষে দুই চারি দিবসের জন্ত
কলিকাতায় গেলেন। নির্বোধ মধুমতী অশান্তের স্নায় ব্যবহার
করিতে লাগিল। তাহার সমবয়স্ক ননদিনী শ্যামাসুন্দরী অনেক
বুঝাইলেন। মধুমতী শ্যামার কিছু অনুবক্তা ছিলেন। করালীর
গমনের পর রাতে শ্যামাসুন্দরী তাহার সাস্থ্যের নিমিত্ত একত্রে
শয়ন করিলেন। মধুমতী ও শ্যামাসুন্দরী উভয়ের নিজা আসিল
না। শ্যামাসুন্দরীর গ্রীষ্ম যন্ত্রণায়, মধুমতীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায়।
শ্যামাসুন্দরীর প্রস্তাবানুসারে উভয়ে শয়ন গৃহ ত্যাগ করিয়া
পশ্চিমের এক বারেণ্ডায় বসিলেন। বারেণ্ডা অতি নিম্ন এমন
কি বালকেরাও ভূমি হইতে সহজে তত্পরি উঠিতে পারে।

সম্মুখে ভাগীরথী, পশ্চাতে অতি বিস্তীর্ণ এক প্রাস্তর। রজনী
দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ণিমার রাত্রি; চন্দ্রমা নিঃশব্দে আকাশে
ভাসিতেছে, নৈশ সমীরণ অতি মন্দ মন্দ হিল্লোলে জাহ্নবীহৃদয়
চঞ্চল করিতেছে। মধুমতী ও তাহার ননদিনী দুইজনে গ্রীষ্ম যন্ত্রণায়
বারেণ্ডায় বসিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
“বউ তোর কি আগেকার কথা কিছু মনে পড়ে না ?” মধুমতী
উত্তর করিলেন “কিছুই না।” পরে উভয়ে নানাবিধ কথোপকথন
হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মধুমতী, সশঙ্ক চিত্তে উঠিয়া বসিলেন।
চন্দ্রিকা বিধৌত জাহ্নবীর উপকূল হইতে স্নকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি
হইল। সঙ্গীত নৈশ সমীরণে আরোহণ করিয়া জাহ্নবীর হৃদয়ে
বিচরণ করিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “হঠাৎ
অমন করিয়া বসিলি যে ?” মধুমতী উত্তর করিল, “ঠাকুরবা !

পূর্ব্বেকার কথা আমার কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু এই গান শুনিয়া আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। আমি যেন একটি গান জানিতাম।”

শ্যামা। গান ত সকলেই জানে—সে আর মনে পড়িবার কথা কি।

গায়ক অতি পরিশ্রুট স্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, গায়িতে লাগিল। মধুমতী বড় চঞ্চলা হইল—বলিল, “শুধু একটি গান জানিতাম তাহা নহে—একটি গান বড় ভাল বাসিতাম, সর্বদাই শুনিতাম মনে হইতেছে। বুঝি সে এই সুর। এ সুরে আমকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। দেখ দেখি কথা বুঝা যায় কি না?” উভয়ে মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। গীতের একটি পদ স্পষ্ট বুঝা গেল—“আদর তরঙ্গ বহে, রূপের সাগরে—” বিহ্বাদগ্ৰিবে এই কথা মধুমতীর হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই পূর্ব্বকৃত গীত বটে। যেমন সভা মণ্ডপে পরিচারক একটি শুদীপ লইয়া সহস্র দীপ জ্বালিত করে, এই গীতে মধুমতীর সেই রূপ হইবার উপক্রম হইল। “আদর তরঙ্গ—” আদর—আদরিণী নামটি মনে পড়িল। কাহার নাম আদরিণী? তাহাও মনে পড়িল। মধুমতী মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এক ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুষ্করিণী—চারিপাশে কদম্বী, দাড়িম্ব, আম্রাদি বৃক্ষ, তন্মধ্যে অনতি বৃহৎ বাস গৃহ। তন্মধ্যে আদরিণী—আদরিণী আর এক জন—এক দাড়িম্ব-তলায় উভয়ে পরস্পর স্বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া—মধুমতী তখন ছুই-হস্তে মুখাবরণ করিয়া চীৎকার করিল না। শ্যামা দেখিলেন, তাঁহার কলেবর স্বৈদান্ত্য কম্পবিশিষ্ট, এবং মূর্ছার পূর্ব্বলক্ষণবিশিষ্ট। মধুমতী চক্ষু বুজিয়া তাঁহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে পীড়িত বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে বউ?” কিন্তু উত্তর নাই, মধুমতী মূর্ছা যান নাই, অজ্ঞান হন নাই, চীৎকার করেন নাই, অথবা কাঁদেন নাই, কেবল মাত্র স্তম্ভিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া শ্যামাসুন্দরীর হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। কিন্তু মূর্ছার লক্ষণ বুঝিয়া তাঁহার ননন্দা তাঁহার

হস্তধারণ করিয়া শয়ন গৃহে যাইয়া তাঁহাকে পর্যাঙ্কে শয়ন করাইলেন। মধুমতী কলের পুস্তকের আয় শুইলেন। শ্যামাসুন্দরী ও মধুমতী এক শয্যায় শয়ন করিলেন। যামিনী প্রভাত হইল। গবাক্ষ নিকটস্থ বৃক্ষস্থিত একটি পাপিয়ার ধ্বনিতে শ্যামার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নিদ্রা ভঙ্গমাত্র মধুমতীর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। গত রাত্রে শ্যামা মধুমতীকে কিদ শিহরিয়া উঠিলেন। গত রাত্রে শ্যামা মধুমতীকে স্বর্ণপ্রতিমার আয় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রাতে মধুমতীকে অঙ্গার খণ্ডের আয় দেখিলেন। ছয় ঘণ্টার মধ্যে কি ভীষণ পরিবর্তন হইয়াছে। এ পরিবর্তন কি শারীরিক পীড়ায় অথবা কোন মানসিক পীড়ায়? সরলা শ্যামাসুন্দরী শারীরিক পীড়া অনুভব করিলেন। এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া মধুমতীকে আরো পীড়িত করিতে লাগিলেন।

করালীপ্রসন্নের বৃহৎপুত্রী নিঃশব্দ, জন মানব দেখা যায় না। কেবল মাত্র বড় দালানে চড়ই পক্ষীর শব্দ শুনা যাইতেছে আর অন্তঃপুর মধ্যে এক কক্ষে শয্যাশায়ী একটি শীর্ণদেহ স্ত্রীলোকের ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনা যাইতেছে। মধুমতী শয্যাশায়ী; কি পীড়ায় শয্যাশায়ী তাহা কোন চিকিৎসক নির্ণয় করিতে পারে নাই। করালীপ্রসন্ন অद्याপি বাটী প্রত্যাগমন করেন নাই, তজ্জন্ত মধুমতীর পূর্বের আয় ব্যাকুলতা নাই। মধুমতী বাহ্যিক ও মানসিক ক্ষমতারহিত হইয়া মৃতবৎ শয্যায় মিশিয়া আছেন।

সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম গগনে বোর মেঘাভ্রমর হইল, রাত্র এক প্রহর, অতি নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী আবৃত হইল। ক্রমে বৃষ্টির সহিত প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। মধুমতী সেই জনহীন বৃহৎ অট্টালিকার এক কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন। শয্যাপার্শ্বে একটি আলোক জ্বলিতেছিল। নিঃশব্দ, কেবল বাহিরে ঝড় বৃষ্টির হ্রস্ব শব্দ, ও হং কর্তৃক কপাট জানেলার বন বনা শব্দ হইতেছিল। আলো কিছু মিট মিট করিতেছিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ চিত্রপটে চিত্র মূর্তিবৎ, মধুমতী মুক্ত দ্বারপথে এক মনুষ্য মূর্তি দেখিতে পাইলেন।

দেখিয়া, সেই বহুকাল বিস্মৃত মূর্তি চিনিয়া, মধুমতী উঠিয়া বসিলেন। মনুষ্য আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল।

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুরুষের চক্ষে অশ্রু বহিল। তিনি বলিলেন, “তুমি এখানে কেন, আদরিণি?”

মধুমতী, অথবা আদরিণি কহিল, “নইলে কোথায় যাইব? মধুমতীর তীরে যখন মরিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমাকে কে বাঁচাইয়াছিল? যিনি বাঁচাইয়াছিলেন, তিনিই আশ্রয় দিয়াছেন।”

লুপ্ত স্মৃতির পুনঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধুমতী বুদ্ধিও পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আগত ব্যক্তি কহিলেন, “ভালই করিয়াছেন—আমি তাঁহার ঋণী হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদিন দেশে আসিয়াছ একবার আমার সন্ধান কর নাই কেন? তুমি কি প্রকারে আমাকে ভুলিয়াছিলে?”

মধুমতী কহিল, “কি প্রকারে ভুলিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না—তবে বলিয়া কি হইবে?”

উত্তরে তিনি কহিলেন, “তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই বিশ্বাস করিব—অথবা তাহা শুনিতেও চাহি না। আমি যে তোমাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতেই আমি স্তুতী। এখন আমার সঙ্গে গৃহে চল।” যিনি বলিতেছিলেন, আছলাদে তাঁহার শরীর তরতর করিতেছিল—কণ্ঠ গদগদ।

তখন মধুমতী, মুখ নত করিয়া, কম্পিত কলেবরে, অক্ষুট স্বরে, কহিল, “গৃহে যাইব? আমার আর গৃহ নাই। তোমার সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ নাই, এ জীবন আর আমার নহে। যিনি হই রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে ইহা তাঁহারই। তোমার আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।” শুনিয়া, আগন্তকের মাথায় ঘেন বজ্রাঘাত হইল। প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—পরে মধুমতীর বিস্ময় জনক কথার মর্ম্মানুধাবন করিয়া, স্বেদাক্ত কলেবরে, মস্তক ধারণ করিয়া বসিলেন। বলিলেন, “আদরিণি, আমি যে তোমার স্বামী?”

আদরিণী কহিল “ছিলে, কিন্তু তোমার স্ত্রী মধুমতী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।”

তখন মধুমতীর পূর্ব স্বামী, কিম্বৎক্ষণ বিশ্বয়বিস্ফারিত চক্ষে, মধুমতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন,— বলিলেন, “আমি কখনই এ কথা বিশ্বাস করি না—আমার আদরিণী যে আমাকে একপ কথা বলিবে, ইহা বিশ্বাস করি না তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছ। আমার এত যত্নের কি এই ফল ? যে দিন তুমি জলমগ্না হইয়াছিলে, সেই দিন হইতে আমি শ্মশান বাসী। সেই দিন হইতে, নদীর তীরে তীরে, শ্মশানে শ্মশানে, কাদায় কাদায়, উন্নতের শ্মায় চৌক্য করিয়া বেড়াইয়াছি। উন্নতের শ্মায় কি ? আমি ত পাগলই হইয়াছিলাম—ঘাটে ঘাটে মাঝি মাঝারা “গোপাল-পাগল” বলিয়া অজুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইত। আমার শরীর দেখ, আদরিণি,—তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই আশ্চর্য্য, এমন দীন দরিদ্র কে আছে, কার শরীর আস্থ চন্দ্রাবশিষ্ট, শুষ্ক, মলিন—কার বস্ত্র এমন শতধা ছিন্ন—কার কেশ এমন রুক্ষ—”

তিনি আর বলিতে পারিলেন না—রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ আসিতেছে, পায়ের শব্দ হইল। গোপাল বলিলেন, “কে আসিতেছে—এ বাড়ীতে আমি চোর—সুতরাং আমি এখন চলিলাম—কাল আসিব।”

মধুমতী কহিল, “আসিও-কিন্তু কাল না। এ গৃহের স্বামী গৃহে আসিলে আসিও। আর এখানে আসিও না। সন্ধ্যার পর, ঐ গজাভীরে আসিও। সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।”

গোপাল চলিয়া গেল। যেটি ভয়ঙ্কর কথা আদরিণী যে তাঁহাকে বিসর্জন দিয়া অজ্ঞকে বিবাহ করিয়াছে সে কথা গোপাল এখনও শুনে নাই। বাহা শুনিয়াছিল তাহাতেই তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কদালীপ্রসন্ন কলিকাতা হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। মধুমতী তাঁহাকে দেখিয়া পূর্বের শ্মায় সাহিত্য সৈকত ৫ □ পূজা—১৩৮৯

হাস্তমুখে নিকটে ছুটিয়া গেলেন না। কেবল মাত্র দ্বিধা চঞ্চল হইলেন যেমন চন্দ্রোদয়ে সাগর চঞ্চল হয়, সেইরূপ চঞ্চল হইলেন।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে শীর্ণ দেখিয়া অতি ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হইয়াছে? কেন এত শীর্ণ হইয়াছ?” মধুমতী উত্তর করিলেন না। করালী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন “কিছু হয় নাই,” করালী তথাচ কহিলেন, “কেন অমন হইয়াছ, আমাকে বলিবে না?” মধুমতী নীরব হইয়া রহিলেন, করালী অতি কাতর স্বরে কহিলেন, “যাহাকে এক মুহূর্তের জন্য না দেখিলে কাঁদিতে তাহার নিকট পীড়া গোপন করিতেছে।” মধুমতী কোন উত্তর দিলেন না। করালী ব্যথিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মধুমতী করালীর মুখপ্রতি চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাহার মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে, এবং চক্ষু ছল ছল করিতেছে। মধুমতী তথাপি কিছু বলিলেন না। করালী অনেকক্ষণ অবধি সেইখানে বসিয়া মধুমতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং অনেক অশ্রুস্রব বিনয় দ্বারা তাহার প্রতি ভাবান্তরের কারণ জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মধুমতী অক্ষিপণ করিলেন না। করালী ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া আপন শয্যাগৃহে ঘাইয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া রহিলেন। বোধ হয় কাঁদিতে লাগিলেন।

রাত্র প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে, আকাশ মেঘাকুল হওয়াতে অতি গাঢ় অন্ধকার হইয়াছিল। গৃধিবী নিঃশব্দ, করালীপ্রসন্নের বৃহৎ অট্টালিকাও নিঃশব্দ, কিন্তু এত গভীর রাত্রে করালীপ্রসন্ন দূরনিঃসৃত মনুষ্য পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। করালী কিছু বিস্মিত হইলেন, পদধ্বন্য ক্রমে নিকটবর্তী হইল। করালী একবার ভাবিলেন চোর আসিয়াছে; আবার ভাবিলেন যে তাহার ভ্রম মাত্র। কিন্তু পদধ্বন্য এত স্পষ্ট শুনা যাঁহে লাগিল যে, করালী তাহার ভ্রম মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—দরায় দারোয়ানটন পূর্বক বাহিরে চতুর্দিক অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। নিশ্চেষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিবার মাত্র আবার

এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

ছাবিতা

ধীমানন্দ রায়

কথায় বলে,—“রূপ-গুণ” ।

তার মানে, প্রতিটি রূপেরই এক একটি বিশেষ গুণ থাকতে বাধ্য । আর গুণের বদল হ'লে ; রূপটা, না বদলে আর যায় কোথায় !

এমনি ভাবেই আমাদের সাহিত্যের রূপের রংটা বদলেছে, সময়-কালের, গুণ বদলের সংগে সাথেই !

ধরা যাক মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কথা । লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি করে, আর তাদের তুষ্ট করে বাঁচার চেষ্টায় যে কাব্য লাচাড়ীর আছাড়ি-পিছাড়িতে রূপ পেয়েছিল, কাল বদলের গুণে, তা শ্রোতার আসর থেকে বিদায় নিল ।

—এমন কি বিহারীলাল যখন “সারদা মঙ্গল” লিখলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যটা ঘনরাম বা মুকুন্দরামের পথ ধরে তো চলই নি, এমন কি ভারতচন্দ্রের ভারত থেকে, অথচ এক জগৎমুখী হয়ে উঠেছিল তা । —আর কে না জানে, রবীন্দ্রনাথের “মঙ্গল” নামধেয় কাব্য নিশ্চয়ই মনসা মঙ্গল ছিল না ; ছিল ব্যঙ্গেরই স্বপ্ন মঙ্গল ।

এত কথা বললাম, এই কারণেই, যে কাব্যের, কন্টেন্ট বদলের সংগে সংগেই তার কর্মও বদলেছে । নোতুন ‘বিষয়’-এর জন্তে দরকার হয়েছে নোতুন “পাত্রের” ।

আধুনিক কাব্যকে তাই পাত্রস্থ করার জন্তেই ডাক পড়েছে, পণ্ডের খান-খড়ম বাতিল করে, গণ্ডের আচকান গায়ে চড়িয়ে উপস্থাসের, ছোট গল্পের ।

কিন্তু না, এতেও এখন কুলোচ্ছে না । কালটা দ্রুত গতিতে চলেছে, একেবারে এসকেপ ভেলোসিটিতে । অতীতের মাধ্যাকর্ষকে সে এখন কেবল পেরোতে চাইছে না, পেরিয়েও গেছে ।

তাই আধুনিক সাহিত্যের রূপের বদলটা ঘটেছে তো অনিবার্য ভাবেই। বলা ভুল হল, “ঘটেছে” নয়, এরই মধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু কি নাম এই অভিনব অত্যাধুনিক সাহিত্য রূপের? আমাদের সাহিত্যের নবজাতক কিছুকাল আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখনও তার নামকরণ করা হয়নি—তবু একটা নাম দেওয়া যাক একে!—ছো-বি-তা!

কিন্তু কেন এই নাম?—উনিশ শতকের শেষের দিকে এ দেশে জন্ম নিয়েছিল ছোটগল্প। প্রথম ছোটগল্প লিখেছিলেন পূর্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই। ১২৮০ (১৮৭৩) বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে, “জী পু’চ” “মধুমতী” ছাপা হয়। লেখক ভেবেছিলেন তিনি বুঝিবা উপন্যাসই লিখেছেন। কিন্তু না! তাঁর কাল, তাঁকে দিয়ে এক “অভিনব ভঙ্গী” রচিয়ে নিয়েছিল!

অনেক পঁরে যার নাম দেওয়া হয়, “ছোটগল্প”। যার সর্বোত্তম রূপ পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া কাহিনীতে।

এটা তো হল এক দিককার খবর। অতীতকে নোতুন যুগের গীতি কাব্যের খবর এসে পৌঁছেছিল বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের লেখাকালেই। মঙ্গল কাব্যের আঙ্গরাখা পরালে কি হয়, উনিশ শতকের উপনিবেশিকতা, রোচ্চিষ্ক-গীতির বৈপাশ্ব্যগতা সৃজন করিয়ে নিয়েছিল তাঁকে দিয়ে।

এ ক্ষেত্রেও অতুলনীয় নির্মিতি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথেই। তাঁর প্রতিভার রেখা ধরেই আমাদের গীতি কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তাই প্রথম মহাযুদ্ধের কালটায় তিনি যখন “লিপিকা” রচনা করলেন—তাঁ দেখে অনেকেই তখন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন—কারণ লিপিকার রচনাগুলোকে, গীতি কবিতা বলতে বাধ্যছিল, আবার তাকে ছোটগল্প বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবে? সেগুলি কি ছিল আসলে?—“গল্পিতা”? “কাব্যর”?

না, এ নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। তবে গীতি কবিতাকে যখন তিনি অস্ত্যানুপ্রাস আর ছন্দের বন্ধন হতে

মুক্তি দিয়েছিলেন, তখন সেই পদ্ধতিকে, যাঁরা অনুসরণ করতেন, তাঁরা তাকে “গবিতা” (গল্পকবিতা) বলেই উল্লেখ করতেন।

তাঁদের সেই নামকরণটা কিন্তু সময়ের ধোপে টেকেনি। কারণ গল্প কবিতা কেবল গল্পে লেখা কবিতা নয়,—অন্য কিছু। অত্যাধুনিক বাংলা কাব্যের একেবারে নোতুন ফসল।

সকলের অজান্তেই, ছোট গল্প আর গীতি কবিতা, উনিশ শতকী সৃষ্টির ঐ দুই অঙ্গ ক্রমশ কাছাকাছি আসতে আসতে একেবারে এক হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের দু'য়ের রূপটা গিয়েছিল তাই বদলে, গুণটাও অপরিবর্তিত ছিল না।

আর এই রূপ-গুণ বিশ্বাসকে, কিছুতেই পুরানো নামের বাস্তববাদীতে রাখা সম্ভব নয় বলেই, অভিনা আর ধারণায় এখন লড়াই বেধে গেছে। এ ক্ষেত্র সমাপ্তি ঘটতে পারে, নোতুনের নামকরণে,—পুরানোকে যদি বাতিল করা যায়।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি :—

আজকের দিনের কবিতা, আর সেকলে জয়ের ছড়ার পোষাকে নেই। এমন কি আধুনিক ছোটগল্পও, তার গত-শতকের শতকিয়া আউড়াতে চায় না। সেই সৃজনশীল শিল্পের ঐ দু-পক্ষ এখন মিলে গেছে এক রসায়নিক যৌগিকে। যার নাম ছোবিতা।

এই ছোবিতারই দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আজকের আলোচনার সমাপ্তি টানবো। একটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে ছ'দশক আগে। লেখক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

আর দ্বিতীয়টি লিখেছেন একেবারে এক অখ্যাত লেখক ; ততোধিক অখ্যাত অসাময়িক এক অসম্পূর্ণ পত্রিকায়। ছোবিতা দুটি এবার লিখে শোনাই :

(১) প্রথম শোক ॥

বনের ছায়াতে, যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে,—ইঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠল, “আমাকে চিনতে পার না?” আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম।

— বললেম, “মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।”

সে বললে, “আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বয়সের শোক।”

তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম “সেদিন তোমাকে জীবনের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ?”

কোন কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলি ফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

এবার, (২) স্থখ ॥

ছেলেটা প্রায়ই নাটকের মহড়ার এদিক ওদিক উকি বুঁকি মারত। খিয়ের ছেলে। নাম তার স্থখ। ঘুর ঘুর করত জানালার এপাশে ওপাশে। ঘরে ঢুকত না।

হঠাৎ সেদিন ডাক পড়ল স্থখ এর একেবারে ঘরের মাঝখানে।

নাটকে ভিখিরীর জামার দরকার। ওর গায়ের ছেঁড়া জামাটা কেড়ে নেওয়া হল।

খালি গায়ে, শীতের রাতে, স্থখ ছেলেটা হি হি করে কাঁপতে থাকে।

তার জামা পরে, নকল ভিখিরী, মঞ্চে উঠে আসর মাৎ করে দিল।

হাত তালিতে ফেটে পড়ল গোটা চম্বর।

দাঁতে দাঁত লেগে, স্থখ তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

অসম্পাদকীয় মন্তব্য :—

কেবলমাত্র পঙ্ক্তি বিস্ত্রাসে অদল বদল ঘটিয়েই এ ছোবিতা ছুটিকে ছোটগল্প আর কবিতায় কি রূপ দেওয়া যায় না? গল্প কবিতা এক হয়ে গিয়েছে কিনা তাই! গুণীজন কি বলেন?

পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া গৃহের মধ্য দেশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন, হঠাৎ শব্দ থামিল, এবং তৎপরক্ষণেই গবাক্ষ পথে শ্মশ্রুবিধিষ্ট এক বৃহৎ মনুষ্য মস্তক দেখিতে পাইলেন। অতি দ্রুত দ্বারোদঘাটন পূর্বক বাহিরে গেলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালীপ্রসন্নর দুই মহল অন্তঃপুর, উভয় মহল আলো লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে, অন্ধকারে বোধ হইল, একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। দ্বিগতাসা করিলেন “কে ও ?” স্ত্রীলোক কহিল “আমি।” করালী স্বরে চিনিলেন, মধুমতী। পুনরপি দ্বিগতাসা করিলেন, “এখানে কেন ?” মধুমতী কহিলেন “কাহাকে খুঁজিতেছ ?” করালী কহিলেন, “জানালায় এক বিকৃতাকার মনুষ্য দেখিয়াছি—তাহাকেই।” মধুমতী কহিলেন, “আমি তাহাকে চিনি—ঘরে চল, বলিতেছি।”

মধুমতী, করালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার শয্যাগৃহে আসিলেন। তথায়, করালী পালাঙ্কের উপর, চরণ লম্বিত করিয়া বসিলেন। মধুমতী তাঁহার চরণ-তলে বসিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ করিয়া, নীরব হইয়া রহিলেন। করালী বিস্মিত হইলেন—বলিলেন “কে সে ?” দেখিলেন, মধুমতী কাদিতেছে।

মধুমতী বলিলেন, “তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ আমি তোমার নিকট যে ঋণে ঋণী মনুষ্যে তাহা শোধ করিতে পারে না। তাহার শোধ দূরে থাক, আমি তাহার পরিবর্তে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—যে জীবন তুমি রক্ষা করিয়াছিলে তাহা আবার নষ্ট কর চিকিৎসা শাস্ত্রে কি তাহার উপায় নাই ?” P 36207

করালী অবাক হইলেন,—বলিলেন, “এসকল কথা কেন ? কে সে ব্যক্তি ?”

মধুমতী শুষ্ক কণ্ঠে, রোদনোন্মুখবৎ নিঃশ্বাসে পূর্ব স্মৃতি পুনরুদয়ের কথা বলিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পটু করালী সে বৃত্তান্ত বুঝিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন। তারপর মধুমতী বলিতে

লাগিলেন, “তখন আমার সকল ক্ষয় হইল। তখন মনে পড়িল, যে আমি যে তোমার নিকট বলিয়াছিলাম, আমি বিশ্বা, সে মিথ্যা কথা। আমি বিশ্বা। আমি জালাগোপাল দত্তের স্ত্রী। তিনি আজিও জীবিত আছেন। এখন যাহাকে দেখিয়াছিলে, তিনিই আমার সেই পূর্ব স্বামী।”

এই বলিয়া মধুমতী কিয়ৎকাল স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। করালীও নীরব হইয়া রহিলেন। মধুমতী পুনরপি বলিতে লাগিলেন, “যে গীত শুনিয়া আমার সব মনে পড়িল, তাহা তিনি অহরহ গাইতেন। আমি তাহা অহরহ শুনিতে ভাল বাসিতাম— সে গীত আমার হাড়ে হাড়ে অঙ্কিত ছিল। পরদিন তিনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।”

এই বলিয়া মধুমতী নিরস্ত হইলেন। করালী কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া বসিয়া উঠিয়া গেলেন। পৃথক শয়নগৃহে গিয়া দ্বারদ্ধ করিলেন। করালীও দ্বারদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন উভয়ে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বকই সাক্ষাৎ করিলেন না। বিশেষ করালী অত্যন্ত ধর্ম্মভীত; তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে অশ্রু স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার সহিত আদরিণীর বিবাহ ধর্ম্মতঃ বিবাহ নহে। এবং আদরিণী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নহে। সে স্থানে তাঁহার সহিত সহবাস ঘোর পাপাচার। এদিকে মধুমতীর সহবাস পরিত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ সহজ। তিনি কর্তব্য বিমুঢ় হইয়া সমস্ত দিন দ্বারদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইয়া চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি হইল। প্রথমে রাতে জ্যোৎস্না। গোপাল অবধারিত সময়ে গজাভীয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। জলে কাহাকে দেখিতে পাইল না—কিন্তু দেখিল যে, বন্ধুপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোক গাত্র মৌত করিতেছে। গোপাল চিনিল যে সেই আদরিণী। বলিল, “আমি আসিয়াছি।”

আদরিনী বলিল, “আর একটু দাঁড়াও—আমার এখনও বিলম্ব আছে। দাঁড়াইয়াই বা কি করিবে, আমার নিকটে এই জলে আইস, একবার আমরা অগাধ জলেও ডুবি নাই, এই বুক জলে ভয় কি? আমার যাহা বলিবার তাহা এই গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তোমাকে বলিব।

গোপাল জলে নামিয়া আদরিনীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। আদরিনী বলিল, “আমি যাহা বলিব, বোধ হয় তুমি তাহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর আমি সত্য কথা বলিব।”

এই বলিয়া মধুমতী পূর্ব ঘটনা সকল সেই জ্যোৎস্না প্রক্লিষ্ট গঙ্গা তরঙ্গ মধ্যে দাঁড়াইয়া, সেই বিজ্ঞান স্তম্ভ মধ্যে মুহু গম্ভীরস্বরে আত্মোপাস্ত্র বিবরিত করিল। করালীর সহিত বিবাহের কথা বলিল। গোপাল মুমূর্ষু বৎ সকল শুনিল। আদরিনীর কথা সমাপ্ত হইলে গোপাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

“আমার যাহা কপালে ছিল তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু তুমি এক শত বিবাহ করিলেও আমার আত্মজ্যা। তুমি আমার গৃহে চল। আমরা এদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গিয়া একলক লুকাইব। কেহ জানিবে না—আমরা আবার তুখে দিন যাপন করিব।”

গোপালের অবিচলিত স্নেহ দেখিয়া, এক আপনার পূর্ব প্রশ্ন স্বরণ করিয়া আদরিনী গঙ্গা স্রোতের উপর দরবিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন, আর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, গলদেশ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, মধুমতী অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমি এখন তোমাকে প্রার্থনা করিব না—আমি তোমার গৃহে যাইব কি প্রকারে? আমি পরের। আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরের। আমি মহা পাপিষ্ঠা। আমি তোমার স্নেহ ফুলিয়া গিয়াছি। আমার সকল ভালবাসা নূতন স্বামীর প্রতি। আমি তোমার গৃহে যাইব না।”

এই বলিয়া আদরিনী আর একপদ জলে অগ্রসর হইলেন। জল চিবুক পর্য্যন্ত হইল। তখন মূর্খ গোপাল, আদরিনীর

শুভিসন্ধি বুদ্ধিতে পারিয়া, ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া নদীর
তট প্রতিক্ষণিত করিতে লাগিল; ডাকিল, “আদরিণি—
প্রাণাধিকে! ও কি—রক্ষা কর এ সর্বনাশ করিও না।” এই
বলিয়া আদরিণীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল

আদরিণী, অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, অধরপ্রান্তে বিখমোহিনী
হাসি হাসিয়া, বলিল, “আমি কিরিব না। কিন্তু তোমার কাছে
এক ভিক্ষা। একবার আমায় আলিঙ্গন কর বুঝি যে আমার
সকল অপরাধ মার্জনা করিলে। যদি আমায় একদিনও
ভালবাসিয়া থাক, তবে এইখানে আমায় একবার জন্মের শোধ
আলিঙ্গন কর।” করালী তখন আদরিণীর মন হইতে অন্তর্হত
হইয়াছিল।

তখন গোপাল গদগদ কণ্ঠে, অতি কষ্টে, বলিতে লাগিল—
“তোমায় আলিঙ্গন করিব আদরিণি। আমারই আদরিণি আমার
কত আদরের আদরিণি? তোমার সাথ মিটাইয়া, জন্মের শোধ
আলিঙ্গন করিব। তুমি একা যাইও না। তুমি যদি কিরিলে না,
আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

এই বলিয়া গোপাল চিবুক পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া,
চিরশ্রমভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

তাহার পর উভয়কে, পৃথিবীতে আর কেহ দেখিল না।

—শ্রী পূঃ

(পূর্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

পুলিশ বনাম বিবেক

—গৌর পাল

ক্রুরতার প্রতিমূর্তি শিবশঙ্কর-যে মনুষ্যের জলাঞ্জলি দিতে পারার জোরেই রাইটার কনট্রোল থেকে ডি, এস, পি হয়েছেন এ বিষয়ে তিনি সদা সচেতন। তিনি আরও জানেন আই, জি সুপারিশ করেছেন, সামনের জাহুয়ারীতে তিনি, অ্যাডিস্তনাল এস, পি নয়, এক লাফে 'এস, পি'র পদে প্রমোশন পাবেন।

এ হেন শিবশঙ্কর ও যে কোনোদিন কোনো দুর্বলতার শিকার হননি এমন কথা হালফ করে বলা যায় না। কারণ, অবিশ্যি হলেও তিনি ভালবেসে বিয়ে করেন, এক জী সন্তানসম্ভবা হলে তিনি সকলকে বলতে থাকেন তাঁদের প্রথম সন্তান নিশ্চয় মেয়ে হবে। জী পদ্মমণি তাঁর প্রত্যাশাকে মেনে নিয়ে বলতেন, মেয়ের নাম মণিদীপা রাখবেন। কিন্তু প্রসবকালে তিনি মারা গেলেন। সন্তানটি বাঁচলো বটে, কিন্তু সেটি মেয়ে নয়, ছেলে। মনে হয়, জীর শেষ ইচ্ছার কথা মনে করেই শিবশঙ্কর তাঁর নাম রাখলেন দীপাকর। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার রুচি না হওয়ায় শিবশঙ্কর ছেলেকে মানুষ করার জন্য তাঁর শাস্ত্রীর কাছে রাখলেন। জী পুত্র পরিবারহীন একক জীবন তাঁর রক্ষা চরিত্র ও চাকরীর পক্ষে শাপে বর হলো, তিনি ঘোরাঘুরির কাজই বেছে নিলেন। ফলে তাঁর পদোন্নতি আরও দ্রুত হতে লাগলো।

অতৃপ্ত জীবন ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠুরতার জন্য পুলিশমহলে সুনাম শিবশঙ্করকে দিন দিন আরো হিংস্র করে তুলছিল। একমাত্র দীপাকরের বেলায় তিনি ছিলেন অবিবাহিত বকমের স্নেহ প্রবণ। ছেলেটি মার আদল পেয়েছিল। তেমনি মুখ, আর রোগা। ঠিক তেমনি লাজুক, স্বপ্নাবিষ্ট চোখ। বাপের ইম্পাতের মত মজবুত শরীর সে পায় নি। কিন্তু তার ভীক কোমল চোখ দেখে বুঝবার উপায় ছিল না সে কী পরিমাণে দুঃস্থ আর জেদী। দিদি-মার প্রজ্ঞায় পেয়ে সে কারো শাসনই মানতো না। একবার শিবশঙ্কর তাঁর খুব বিশ্বাসী এক জুনার অফিসারের সঙ্গে তাকে ছমনার

মেলা দেখতে পাঠিয়েছিলেন। দীপঙ্কর সেই কর্মচারীটির সমস্ত বাধা নিবেদন অমান্য করে একটা বেদের কাছ থেকে উকি দিয়ে নিজের ডান হাতের নাম লিখিয়েছিল। তাও নামটা “দীপঙ্কর” না লিখিয়ে “দীপু” লিখিয়েছিল। বিষাক্ত আরকের প্রভাবেই হবে, হাতটা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে যায়। এই বেয়াদবি অন্য কেউ করলে শিবশঙ্করের কাছে তার রেহাই থাকতো না। কিন্তু মা হারা ছেলের এই দুর্বিনীত জেদ আর খাম খোয়াল তাঁকে রাগে দিশেহারা করে দেওয়ার বদলে করুণ মমতায় উদ্ভিগ্ন করে তুলেছিল।

কিছুদিন থেকে একঘেষে একাকী শিবশঙ্করের অসহ্য লাগছিল। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াতেও আর ভাল লাগছিল না। এখন অবশ্য তিনি চাইলেই সদর দপ্তরে স্থায়ী পোষ্টিং পেতে পারেন। তাই কিছুদিন থেকেই ভাবছিলেন, এইবার স্থায়ী বাসা করে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। ইচ্ছাটা তাঁকে এমনই পেন্সে বসলো যে সদরে যখন বদলীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলো তখন মনের মত সরকারী কোয়ার্টার পেতে দেয়ী হবে বুঝে শেষ পর্যন্ত সদরে একটা চমৎকার ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে ফেলেন।

এমন সময় হঠাৎ একদিন সাঁওতাল পরগণার উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী চাষীদের মধ্যে অশান্তির খবর এলো। শিবশঙ্কর বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের মংড়া ও হুন্ডা এই দুটো পুলিশ ক্যাম্পই পরিদর্শনের ভার নিলেন এই ভেবে যে, ওখানের কাজ সেরে খুব কাছেই দর্শনদী গ্রামে তাঁর স্বস্তরবাড়ী যাবেন ও ছেলেকে নিয়ে সদরে ফিরবেন।

রাতে মংড়া ক্যাম্পে পৌঁছে শিবশঙ্কর শুনলেন উত্তর বিহারের এক কেরারী চাষীনেতা ঐ গ্রামেরই পোড়ো শিবকোঠার ঘরে লুকিয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে আঘেয়াস্ত্র থাকতে পারে ভেবে পুলিশ ইন্সপেক্টর উপযুক্ত ব্যবস্থা করে শিবকোঠা ঘেরাও করতে দেয়ী করে ফেলায় নেতাটি উধাও হয়েছে। ঘরা পড়েছে হুন্ডন গ্রামবাসী। তারা ঐ পলাতক নেতার জন্য রুটি জল এনেছিল।

ইন্সপেক্টরের মুখে সব ঘটনা শুনে শিবশঙ্কর ক্ষেপে গেলেন।

অপদাৰ্ঘ ইন্সপেক্টরের ওপর বে রাগটা হয়েছিল সেটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়লো ঐ ছদ্মন গ্রামবাসীর ওপর। যতক্ষণ না তারা ফেরারী নেতার বর্তমান আস্তানা। পুলিশকে দেখিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ তাদের ওপর লাগাতার পীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে তিনি হুকুম দিলেন। ইন্সপেক্টর ঢোক গিলে বল্লো “কিন্তু স্যার, ঐ accomplice দুটোর একজন খুব অল্পবয়সী।” শিবশঙ্কর ক্রুর হাসি হেসে হুকুম দিলেন “Torture টা তাকেই একটু বেশী করে করো, কাজ হবে।”

শেষ রাতে কে একজন এসে শিবশঙ্করকে জাগালো। বল্লো, ঐ ছদ্মন সমাজ বিরোধী একজন কোনো গোপন ঘাঁটির খবর না দিয়েই মারা গিয়েছে। পাথরের ওপর ফেলে হাত পা ছেঁচে দেওয়ার সময় ও সে বেশ সজ্ঞানে ছিল, কিন্তু মলদ্বারে লাঠি পুরে দেবার সময় হঠাৎ বার দুই রক্তবমি করে স্ত্রান হারায়। মনে হয়, এর আগে বুকে বুটের চোকর মারার সময় কোনো পাঞ্জর ভেঙ্গে গিয়েছিল।

ঝুম চটে যাওয়া শিবশঙ্কর থিঁচিয়ে উঠলেন। হুকুম দিলেন, “রাতারাতিই লাশটার গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে এসো। ভোর হওয়ার আগে কাজ শেষ না করলে আমি প্রত্যেককে সাসপেন্ড করবো।” হুকুম দিয়েই তিনি বিছানায় উঠে বসলেন এবং লোকটাকে খামতে বসেন। ভাবলেন, নাঃ একবার নিজেই দেখে আসি, শয়তানের বাচ্চাটা সত্যিই মরেছে, না নখরা করছে।

সজ্জস্ত সেল্ট্রির সেলাম নিয়ে শিবশঙ্কর একাই শিবকুঠির ঘরে ঢুকলেন। রাত তখন সাড়ে তিনটে। দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে।

হঠাৎ বিভ্রান্ত সেল্ট্রি শিবকোঠার ভেতরই কুকুরের ডাক শুনে দরজায় উকি দিলো। দেখলো, ডি, এস, পি শিবশঙ্কর আড় হয়ে পড়ে যুক্ত ছেলেটার ডান হাতটা ধরে আছেন। আটা ছানার মত করে ঝেঁতলানো, রং বদলে যাওয়া সেই কচি হাতের ওপর কালো উষ্মিতে লেখা “দীপু” কথাটা মিটমিটে লঠনের আলোতেও পড়া যাচ্ছে।

শিবশঙ্কর চৌধুরী পুলিশের চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। ‘এস, পি’ হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর দুর্বল খাতে সহিলো না। না হলে ৩৬ বছর বয়সেই কি কারো মাথার সব পুল সাদা হয়ে যায়?

প্রতীক্ষা

কাকলি ভট্টাচার্য

শ্যামল জন্মাক্রম নয়। আট দশ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে গেল সে পল্ল হয়ে। পরপরই বাবা মা হারালো। এ বিশ্বে আত্মীয় বলতে আর কেউ রইল না তার। তবু কয়েকজন পরিচিতরা মিলে তাকে অন্ধদের আশ্রমে রেখে এল।

শ্যামল সেই আশ্রমে থেকে বড় হ'ল। গান শিখলো, তবলা শিখলো। গলাটাও বেশ মিষ্টি। তার সহজ-সরল ব্যবহারে সবাই তাকে ভালোবাসে আন্তরিক। তার সবসময়ের সঙ্গী একটা লাঠি নিয়ে সে অনায়াসে আশ্রমের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। বাইরে গেলে কারও সাহায্য তাকে নিতেই হয়। পাশাপাশি মোটামুটি সে গান বাজনায় পরিচিত হয়ে গেছে। নিজের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারবে এই আশায় সে একদিন আশ্রম ছেড়ে একটা মেসে এসে উঠলো এবং অল্প দিনের মধ্যেই সে কয়েকটা টিউশনি জোগার করে ফেললো।

শ্যামল এখন প্রতিমাসে যোজগার করে ভালই। বন্ধুরা এটা-ওটা বায়নাক্রা করে কিছু খরচ করে আর কিছু কিছু টাকা তার থেকেই যায়। স্ততরাং দিন তার সহজ গতিতেই চলে। এখন সে রীতিমত একজন যুবক, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক কিন্তু ছুটি চোখের জঙ্ঘ সে বড় কষ্ট পায়। বালক বয়স হতে সে পৃথিবীর সুন্দর রং-রূপ-বর্ণ দর্শন লাভ হ'তে বঞ্চিত। জানে এ দৃষ্টি সে আর কোনদিন ফিরে পাবেনা। এক্ষণে তার প্রচণ্ড অভিমান হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তবু যুবক শ্যামলের একটি সাধ জাগে বার বার, আর একজনের দৃষ্টি দিয়ে এ পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে। আর একজনকে বুকের কাছে এনে সমস্ত রুদ্ধ প্রেম উজ্জাড় করে দিতে। একটি কোমল হাতের উপর ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত ভার সমর্পন করতে। একলা থাকলে সে অনেক কথাই কল্পনা করে।

মেসে যে ছ-একজন বন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তাকে তারা জেনে ফেলেছে তার এ দুর্বলতার কথা। কয়েকদিন পরে তারা জানালো একটি বাপ-মা হারা নিরাশ্রয় মেয়ে আছে। সে তার মামার কাছে থাকে। মামাও খুব গরীব তাই চার'শ টাকা পেলে শ্রামলের সঙ্গে তার ভাগ্যকে বিয়ে দিতে রাজী আছেন। কথাটা শুনে প্রথম বসন্তের রোমাঞ্চ চেউ তুলে গেল শ্রামলের বুকে। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। বন্ধুরাই দিন ঠিক করলো। জামা-কাপড় কেনা-কাটা করে দিল। সে ভাবী বউএর জন্ম হুন্দর দেখে কয়েকটা শাড়ি কেনালো বন্ধুদের দিয়ে, এখন শুধু অপেক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির জন্য।

বিয়ের দিন সকাল থেকে শ্রামল চুপচাপ বসে রইল ঘরের মধ্যে। যে আসছে তার দোসর হয়ে তাকে সে দেখতে পাবে না ঠিকই, তবু তার অন্তঃস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করবে, ভালবাসবে। এখন তার মনে হল সে যেন আর একা নয়, অসহায় নয়। তার সমস্ত মনের মাধুরীর রং দিয়ে আঁকা তার প্রিয়া আসছে তার ঘরে। কিন্তু সেই মেয়েটি যদি তাকে পছন্দ না করে, যদি ভালো না বাসে! মনের আর এক সস্তা বলে-না, তাকি হয়, একজনের অকৃত্রিম ভালোবাসা কি আর একজন উপেক্ষা করতে পারে! সে ভালোবাসবে, বুকের গভীর থেকে সমস্ত ভালোবাসা তুলে তুলে ঢেকে দেবে, সাজিয়ে দেবে তার মানসীকে। কোন সাধ তার অপূর্ণ রাখবে না সে। একদিন তার সমস্তান আসবে। সে তার কচি হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বাবা বলে ডাকবে তাকে। ইস! ভগবান স্বর্গস্থ কি এর চেয়েও হুন্দর।

বেলা গাড়িয়ে ছপুর হ'ল। বিকেল হয়ে সন্ধ্যা হল, বন্ধুদের তবু পাত্তা নেই। শ্রামল চক্কল হয়ে উঠলো ক্রমে। হাতড়ে হাতড়ে লাঠিটা নিয়ে বারান্দায় এলো, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো আবার ঘরে এসে বসলো। এমনটি তো! হবার কথা নয়; তবু রাত হ'ল শ্রামলের বন্ধুরা আর এলো না তাকে নিতে বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর জন্য। সকাল বেলা চার'শ টাকা নিয়ে সেই যে তারা বেরিয়েছে আর একবার ও ফেরেনি।

অদৃষ্ট দৃষ্টিই যখন নিয়েছে কেড়ে শুভদৃষ্টি তাই আর হলনা তার। অন্ধ ছুটি চোখ বেয়ে অবিজ্ঞান জলের ধারা গড়ালো। বুকের মধ্যে জমাট-বাঁধা অনেক প্রেম দুঃখ হয়ে গলে গলে ভেসে গেল বুক। কেউ সাক্ষী হয়ে রইল না তার এ মর্মবেদনার।

জীবনের দুঃখ কষ্ট

প্রভাতকুমার গোস্বামী

সোভিয়েত রাশিয়া যাবার আগে অনেকে আমায় অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘তু’ এক জনের পরামর্শ ছিল একটু বিশেষ ধরনের। তাঁরা বলেছিলেন, “দেখুন ওখানে গিয়ে তো আপনি ইচ্ছামতো দেখতে পারবেন না, ওরা যা দেখাবে তাই দেখতে হবে। চেষ্টা করবেন নিজে থেকে কিছু দেখতে। ওরা যে বলে ওদের দেশে দুঃখ কষ্ট নেই; দেখবেন তো কথাটা সত্যি কিনা।”

কথাটা আমার মনে ছিল। তাই তাসখন্দ বিমান বন্দরে অবতরণের পর থেকেই চোখ কান খাড়া রেখেছিলাম। আমি গোটা পাঁচেক শহর ঘুরবো, এক একটা শহরে দিন তিন চার করে থাকবো। তাই এটা ঠিক যে, আমি যাম্ছি জেনে সব শহরকে দুঃখ কষ্ট হীন মানুষ দিয়ে সাজিয়ে রাখা তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার মতো কত বিদেশীই তো প্রতিদিন ওখানে যাচ্ছেন, যোজাই তো আর দেশকে সাজানো যায় না।

যা হোক তবুও তাসখন্দ বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছুটে চললো যে পথ দিয়ে সে পথের কাছে আমাদের চিত্তরঞ্জন এভিনিউ গলি বিশেষ। সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কোনও ভিখারী বা নোংরা কাপড় পরা লোক তো নয়ই রাস্তার ধারে একটা ভাঙ্গা দালান, বস্তির ঘরের মতো ঘরও দেখিনি। নিশ্চয়ই আমায় দেখে রাস্তার ভিখারী বা মরিজ মানুষগুলো লুকিয়ে পড়েনি এবং সোভিয়েত সরকার নেহাড়া ভাঙ্গা বাড়ীগুলিকেও চেক রাখেন নি।

তাসখন্দে মধ্য এশিয়া ও কাজাকস্থানের মুসলিম বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন আমি তাঁকে বললাম, “দেখুন আপনারা ঈদ উৎসব করেন জানলাম, কিন্তু ঈদের দিনে গরীব-দুঃখী, অন্ধ আতুরদের দান খয়রাত করে যে

পুণ্য অর্জন করবেন সে সুযোগ তো আপনাদের নেই। আমি আজ তিন চার দিন এ শহরে আছি, কিন্তু ঐ রকম লোক তো আমার নজরে আসেনি।”

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, “দেখুন কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, সরকারই আমাদের ঐ ভাবে পুণ্য অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। নবেম্বর বিপ্লব দেশ থেকে দারিদ্র্য নিমূল করেছে।”

তাসখন্দ থেকে এলাম ষ্ট্যালিন-গ্রাড-এ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শহর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই শহরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই শহরে যেমন কয়েক সহস্র সৈনিকের কবর রচিত হয়েছে তেমনি এই শহরেই কার্যকর ভাবে ক্যাসিষ্টদের প্রতিরোধ করছে হাজার হাজার অসামরিক ব্যক্তি এখানে মৃত্যু বরণ করেছেন। দু’ এমটী গাছ ছাড়া এবং সামান্য কয়েকটা বাড়ী ছাড়া যুদ্ধের পরে এখানে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তাই এখানে তো গৃহহীন দরিদ্র মানুষের থাকার কথা। কিন্তু আজ নতুন করে এই শহর গড়ে তোলা হয়েছে। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাড়ী যুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়েছে, আর সব জায়গা থেকে যুদ্ধের স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হয়েছে।

এই শহরে ‘কালন্ হিরোজ স্কোয়ারে’ রয়েছে গণ-কবর। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ যেখানে দেশ বিদেশের মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা সামরিক পোষাকে এসে সামরিক কায়দায় শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

এই স্কোয়ারে আমি সেদিন বিকেলে বেঞ্চিতে বসে বসে দেখছিলাম। দেখি এক বয়স্ক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে বসলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। আমিও উৎসাহিত হলাম। কথাবার্তা শুরু হলো দোভাষী মারফত।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন যে, তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক। স্থানীয় একটি কারখানায় কাজ

করতেন। বছর খানেক আগে চাকুরী শেষ হয়েছে। আমি ভারতীয় এটা বুঝতে পেরে আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে এসেছেন।

ভাবলাম ভালই হলো, একজন সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হলো, দেখা যাক তাঁর হুঃখ কষ্টের কথা কিছু জানা যায় কিনা।

অনেকক্ষণ আলাপ হলো, আমার দেশের অনেক কথা জানতে চাইলেন, আমি বললাম।

ওঁর নিজের কথা, ওঁর পরিবার পরিজনদের কথা বললেন। অবসর গ্রহণের পরেও খাওয়া পত্রার কোনও হুঃশিস্তা নেই। তা ছাড়া হুঃটি ছেলে মানুষ হয়েছে, সব বলে সে ওঁর সব চেয়ে হুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

বললেন, “জান, আমার খুবই হুঃখ, মনটাও খারাপ লাগে সেই ক্ষণে।”

আমি উৎকর্ষ হয়ে শুনলাম। ভদ্রলোক বললেন—“আমার হুঃটি ছেলে। তাদের আবার প্রত্যেকের হুঃটি করে ছেলে। অথচ আমি চাই আমার একটি নাতনি হোক, আমারও মেয়ে নেই, একটি নাতনিও হলো না।”

সামনে ছুটোছুটি করছে এমন একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক—“আমার যদি এমন একটি নাতনি থাকতো।”

সত্যিই ভদ্রলোক হুঃশী। কিন্তু এ হুঃখ দূর করবে কে?

Registered with the Registrar of News Paper for India
Decl. No. 41/13/AL/81 P. Regd. No-WB/NDA/(S)-64

দুর্গোৎসব এখন আর বাঙালীর উৎসব মাত্র নেই।
সর্বভারতীয়ের শারদোৎসব। বলা যায়, প্রতিটি ভারতবাসীর
আকাঙ্ক্ষিত জীবনোৎসব।—এই উৎসবের শরিক আমরাও।

এই আনন্দোৎসবে আমরাও আছি আপনাদের পাশাপাশি।
আমরাও সারা বছর ধরে ভেবেছি কোন রঙে কোন ডিজাইনের
শাড়ীতে এবারে সাজাবো। না, দেবীকে নয়, মানবীকে।
কোন ডিজাইনটা আপনাকে মানাবে ভালো তা আমরা
ভেবেছি সারা বছর ধরে।

টাক্সাইল শাড়ীর কথা বলছি। টাক্সাইল শাড়ী এখন ভারতের
যে কোন স্থানের যে কোন সমৃদ্ধ কাপড়ের দোকানে খোঁজ করলেই
পাবেন। মিলের শাড়ী থেকে হাতে টানা তাঁতের শাড়ী যে অনেক
বেশী টেকসই এবং সুলাভ আর এর কদর যে অল্পদের তুলনায়
অনেক বেশী তা' বোধ করি আমাদের বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তবু বলবো, চলে আসুন না সরাসরি আমাদের কাছে।
চলে আসুন একেবারে মাকু টানার দেশে। দেখতে পাবেন সূতোর
টানাপোড়েনে কেমন করে তৈরী হচ্ছে শাড়ী। আর আমাদের
স্টল থেকে শাড়ী কিনলে অল্প যে কোন দোকান থেকে যে দামে
সস্তা হবে তা, বলাই বাহুল্য উপরন্তু পুছো মরশুমের ২০% ছাড়।

**ফুলিয়া টাক্সাইল শাড়ী বয়ন শিল্প
সমিতি লিঃ**

**টাক্সাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমন্বয়
সমিতি লিঃ**

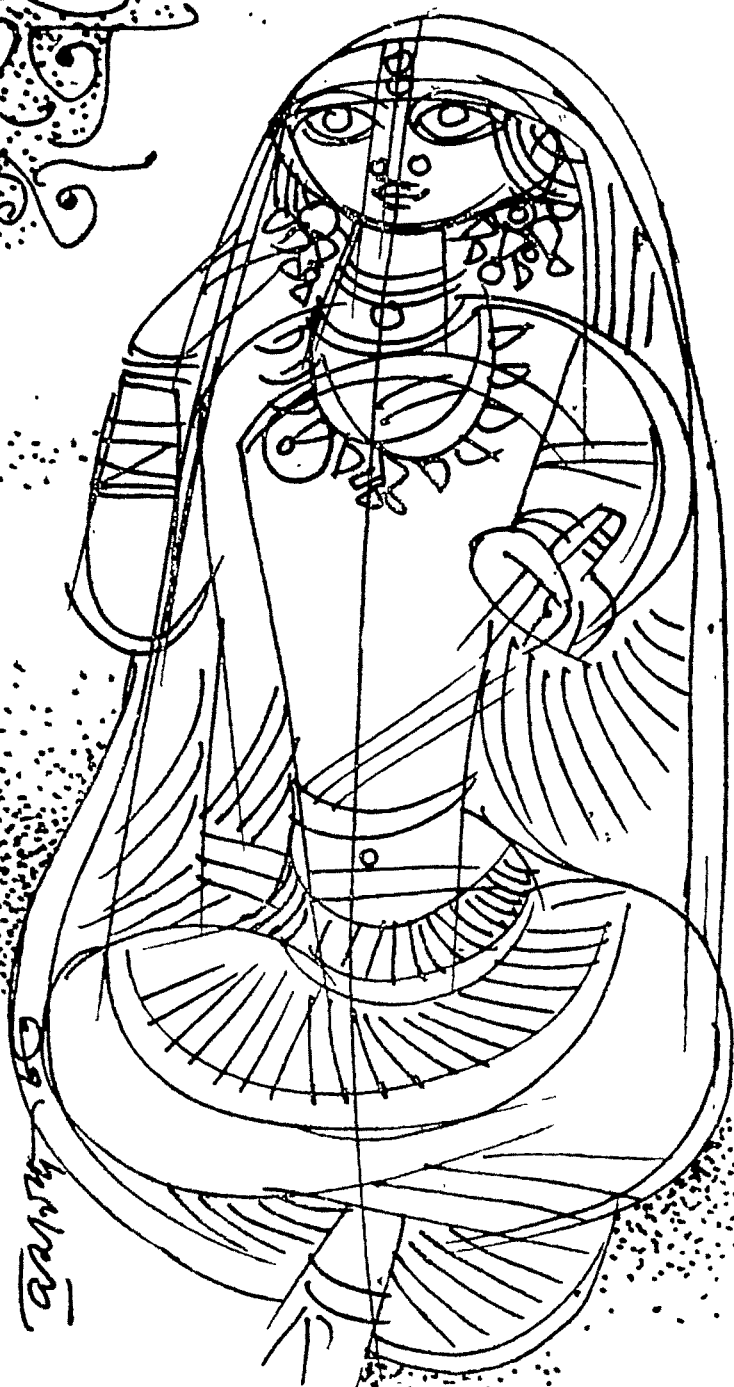
বৈঁচা বসাক পাড়া, ফুলিয়া, বদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য * প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য

প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া।

মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

ଆମର
ଆଶିଷ



ফুলিয়া মার্কেট ডেভেলপমেন্ট কোঃ অপঃ সোসাইটীর মূল
লক্ষ্য প্রকৃত বাবসায়ীদের মাধ্যমে জমি বর্টন করিয়া বাজারের
মধ্যে সমস্ত রকম বাবসা যাচাতে প্রসার লাভ করে সে
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাজারের সার্বিক উন্নয়ন। এ বিষয়ে সকলের
অঙ্গ সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

গৌরীশঙ্কর ভদ্র

প্রশাসক

ফুলিয়া মার্কেট ডেভেলপমেন্ট

কোঃ অপঃ সোসাইটী লিঃ

মহিত মিষ্ট

খুলিয়া মঞ্চ

বর্ষ ২, সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ-মার্চ ১৯৮০

সূচী

প্রচ্ছদ—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র

ই-৯

সম্পাদকীয়

১

নন্দলাল বসুর অপ্রকাশিত ছবি ও চিঠি

৩

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী—সুখময় মুখোপাধ্যায়

৫

Phulia was it a Dream ? S. K. Dey.

৯

ফুলিয়া শহরের বুনিয়াদটা অনেক শক্ত করে লাগান হয়েছিল

এস. কে. দে

২৩

জীবনে যদি সবচেয়ে শক্ত কোন প্রফেশন থাকে সেটা হলো

শিক্ষকতা—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭-৩০, ৭৪-৭৯

শিক্ষার ক্ষেত্রে ফুলিয়ার অচল মন্তব্যতা—গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী

৩১

মূল কথা হচ্ছে এটা কার বেবী—সমরতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭

জনমানসের সৃষ্টি সামর্থ্য আমি

প্রচণ্ড আস্থাশীল—সন্তোষকুমার ধর

৩৯

ফুলিয়া উপনগরী পরিক্রমা—দেবপ্রসূন ষটক

৪৫

ফুলিয়া উপনগরী—মোহিত ভট্টাচার্য্য

৭৯

ফুলিয়ার আদিবাসী—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

৫১

ফুলিয়ার তাঁতশিল্পে সমবায়ের ভূমিকা—হরিপদ বসাক

৫৫

ফুলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি কথা—মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস

৬২

ফুলিয়া উপনগরীর পুনর্বাসন - মণীন্দ্রনাথ মজুমদার

৬৬

ফুলিয়ার শিল্প ও শিল্প শিক্ষালয়—শিশির কুমার সিংহ

৬৯

আমার শিল্প জীবনের তীর্থক্ষেত্র—পাঁচু গোপাল দত্ত	৭২
ফুলিয়া কলোনির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা	
দিলীপ কুমার দাশগুপ্ত	৮০
ফুলিয়া উপনগরীর ইতিকথা—চারুচন্দ্র জোয়ারদার	৮৩
উপেক্ষিতা উপনগরী-ফুলিয়া—সুনীল চন্দ্র দাস	৯১
ফুলিয়া উপনগরীর সমাজ—গণেশ রায়	৯৬
একটি শিশুর আঁকা ছবি	১০১
ফুলিয়ার মাটিতে কৃষ্টিবাসের উদ্ভবকাল—মাধব ভট্টাচার্য	১০২
এক নজরে সাম্প্রতিক ফুলিয়া—মাঃ ভঃ	
পুস্তক আলোচনা—কাকলি ভট্টাচার্য	

পত্রিকা প্রসঙ্গে

লেখকদের প্রতি :

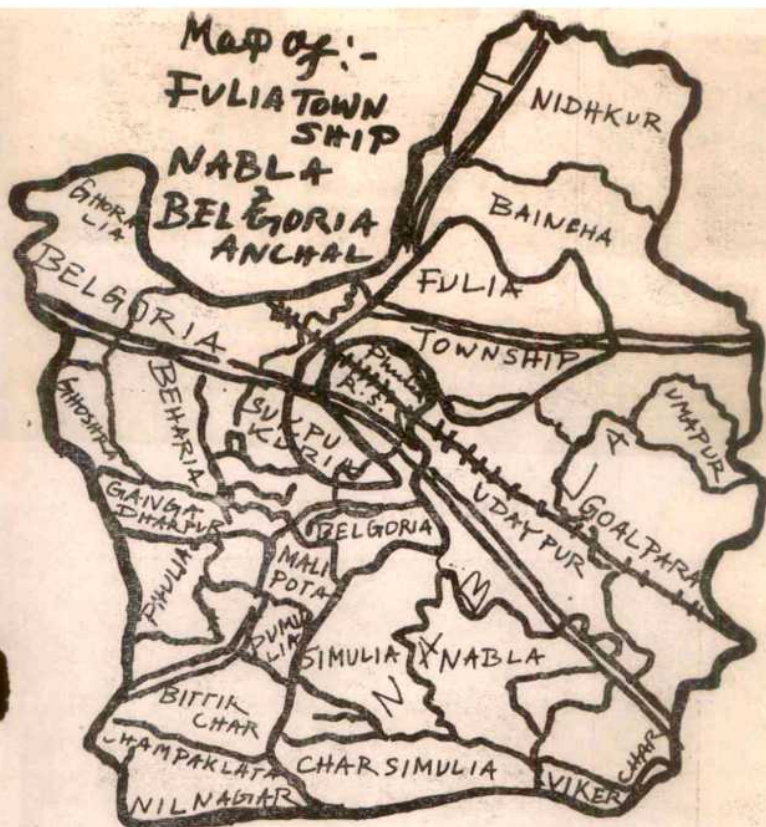
“সাহিত্য সৈকত” পত্রিকায় যে কেউ লেখা পাঠাতে পারেন। তবে লেখার বিষয় বস্তু নিয়ে আগের থেকে আলোচনা করে নিয়ে লিখলে ভাল হয়। স্থানীয় লেখক লেখিকারা তাঁদের লেখা নিয়ে সরাসরি আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রতি রবিবার বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা অবধি সম্পাদকীয় দপ্তর আলোচনার জন্যে খোলা থাকে।

পাঠকদের প্রতি :

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক টাঙ্গা ৮০০ টাকা। সাধারণ ডাকে ৯০০ টাকা। মোট ৪টি সংখ্যা। বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত দাম লাগেনা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি :

বিজ্ঞাপন আধুনিক ব্যবসার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যবসাকে যদি আধুনিকতর করতে হয় তাহা আপনাকে বিজ্ঞাপনমুখীন হতেই হবে “সাহিত্য সৈকত”-এ বিজ্ঞাপন দেয়ার লাভ শুধু ঘরে ঘরে আপনার প্রাতিষ্ঠানকে পৌঁছে দেয়াই নয়-এ এক দীর্ঘকালীন দলিল হয়ে থাকে।



ফুলিয়ার সীমানাচিত্রঃ রেখাঙ্কন—মাঃ ভঃ



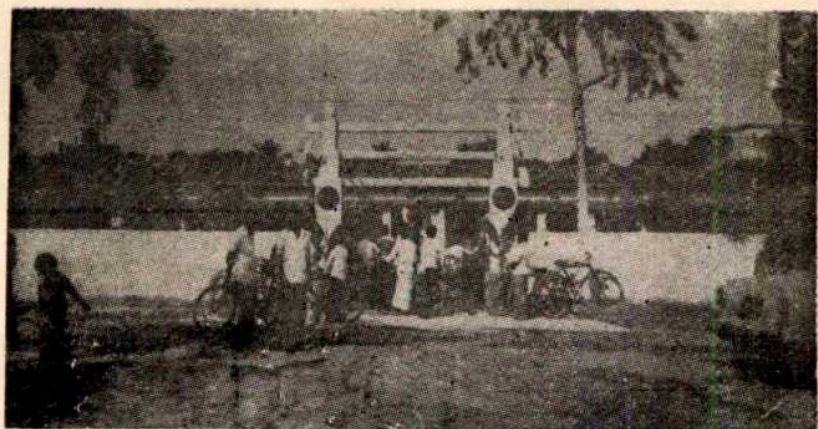
গঙ্গা। ফুলিয়া মাটিতে।

আলোক চিত্র—মাঃ ভঃ

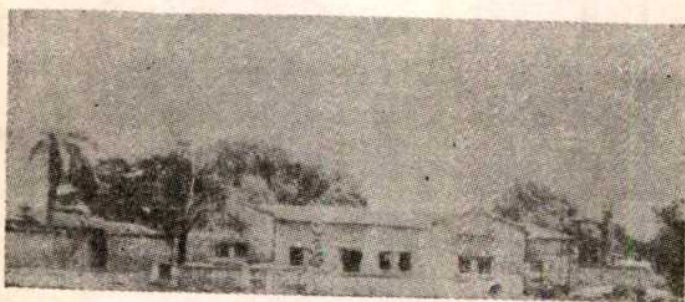
বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—ই

“মজুর মঞ্জিল” উপনগরীর ভিত্তি
প্রস্তর প্রতীক।

সাহিত্য সৈকতঃ

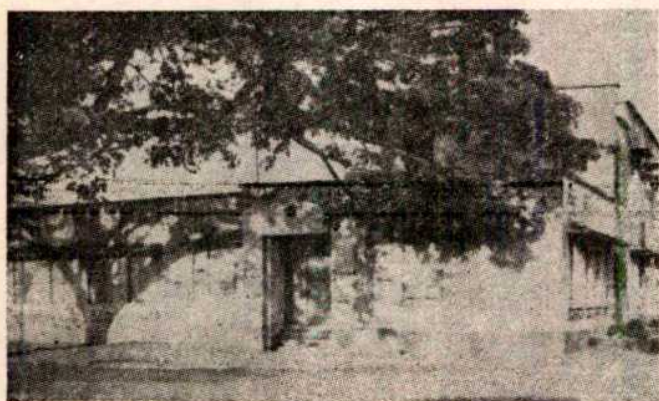


ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন



ফুলিয়া পলিটেকনিক

আলোক চিত্র—ইমেজ ষ্টুডিও

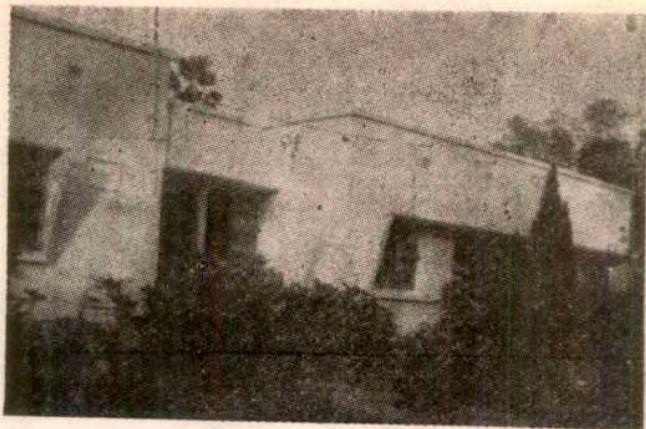


ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়

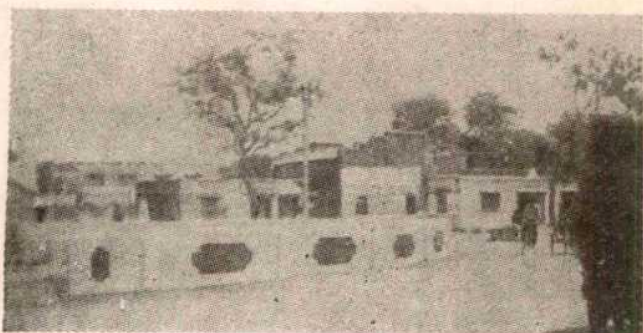
আলোক চিত্র—মা: ভ:

সাহিত্য সৈকত

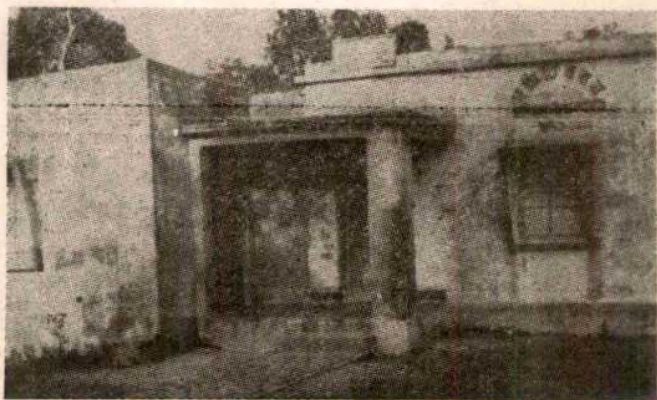
বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—৯



কুস্তিবাস স্মৃতি ভবন তথা সংগ্রহশালা ।

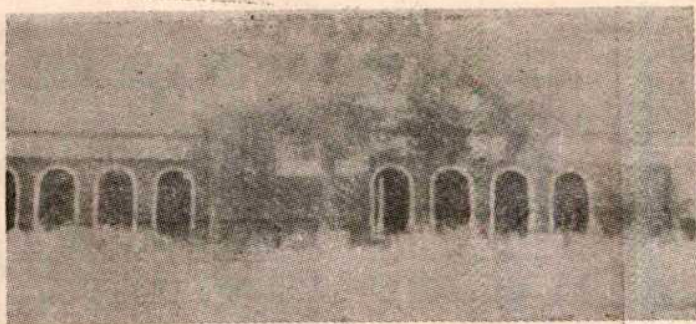


ফুলিয়া গ্রাম্য পাঠাগার, বঙ্গমঞ্চ, জনরঞ্জন কেন্দ্র
আলোক চিত্র—ইমেজ ষ্টুডিও



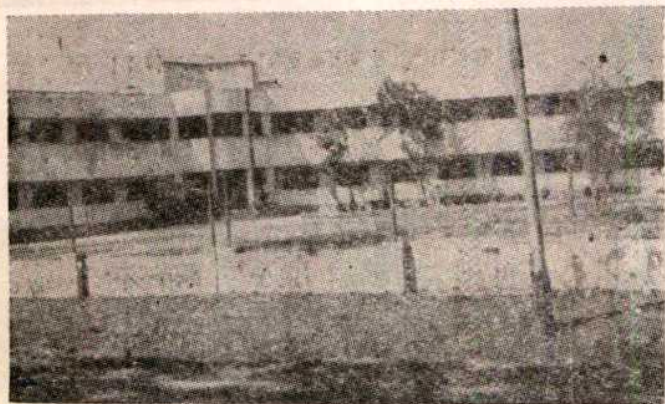
মহিলা সমিতি

আলোক চিত্র—মাঃ ডঃ

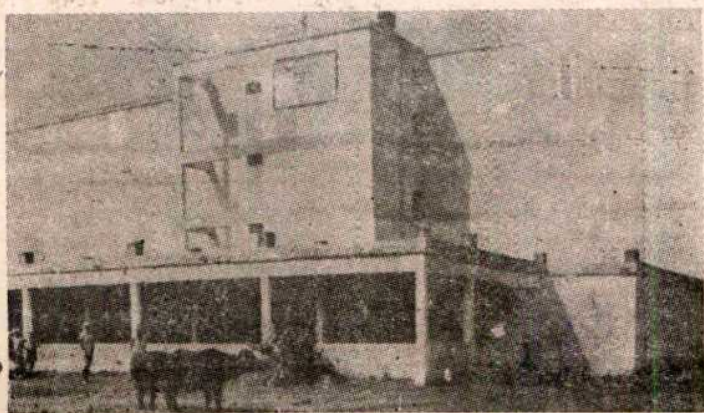


বন্ধের মুখে ফুলিয়া হেলথ সেন্টার

আলোক চিত্র - ইম্বেজ ষ্টুডিও



গ্রাম সেবক ও শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রাবাস। বছরের অধিকাংশ সময় ছাত্রবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকে।

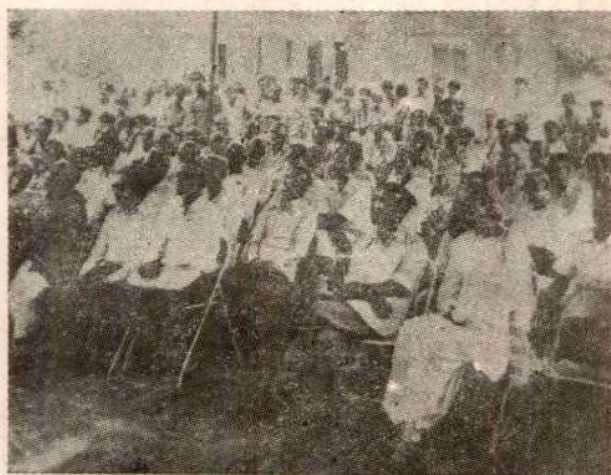


কোল্ড স্টোরেজ—ফুলিয়া

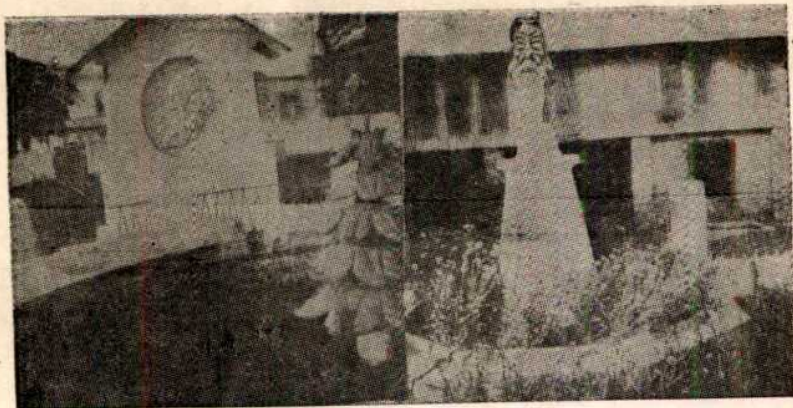
আলোক চিত্র - মা: ভ:



ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন প্রাঙ্গণে ভাষণরত
শ্রীএস, কে, দে



উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী
আলোক চিত্র : ইমেজ ষ্টুডিও



ছই শিল্পীর হাতে রবীন্দ্রনাথ, বা দিকেরটি মুছুল বন্দোপাধ্যায়ের
ভাস্কর্য। ডান দিকেরটি রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের। ফুলিয়া
রবীন্দ্রপার্ক ও পলিটেকনিকে রক্ষিত।

For Block etc Please Dial—277249

SUPER PROCESS

23 Eden Hospital Lane, Calcutta—700073

Courtesy Publicity

নববর্ষের

প্রথম মাসেই

পুনরায় খুলছে

শ্রীকৃষ্ণ টকীজ

ফুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ~~এই~~ আছে। কবিতাটি হলো—

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিঙ্ঘ।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু ছুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু ॥

—বস্তুত: এটাই হয়ে থাকে মানুষের জীবনে। দূরের জিনিসকে জানার প্রতি আমাদের যতটা আগ্রহ ও আকর্ষণ আছে জিনিসের প্রতি ততটা নেই। এটা মানুষের অনেকটা স্বভাবজাত। কাছের জিনিসকে যদি অবহেলা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখি তো তার মধ্যেও সম্পদ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কেননা, যেখানেই মানুষের বাস সেখানেই তো সংস্কৃতির কিছু না কিছু ছোঁয়া রয়েছে। তাই কাছের মানুষের কথাই বলতে চেয়েছি আমরা বর্তমান সংখ্যাটিতে।

“সাহিত্য সৈকত” এর বর্তমান সংখ্যাটি ফুলিয়ার মাটি ও মানুষকে ঘিরে। এই মাটিতেই জন্মেছিলেন একদিন কৃষ্টিবাসের মত কবি। এই মাটিতেই একদিন চাষ হয়েছে নীলের। কৃপণ জমিদার আর অর্থপিশাচ নীলকর সাহেবদের শোষণ চলেছে এখানকার সরল মানুষগুলোর ওপর। প্রকৃতি কত মানুষকে বাস্তবহারা করেছে আবার ভিন দেশের বাস্তবহারা কত মানুষ এসে নোতুন ফুলিয়া গড়ে তুলেছে। এখন তো প্রায় হাজার পঞ্চাশেক লোকের বাস। এখানকার শিল্পীদের হাতে তৈরী “টাঙ্গাইল শাড়ী” আজ বৈদেশিক যুগ্ম আনছে। আনছে, কিন্তু তাঁতীর শোষণ কমেনি আজও। যে শিল্পী নিজ হাতে শাড়ী বুনলেন তিনি জানেন না তার হাতে বোনা শাড়ী কোথা থেকে কোথায় গেলো, কত টাকায় বিকোলো।

কৃষ্টিবাসের কাল থেকে সাম্প্রতিক কালের ফুলিয়া প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছরের ব্যবধান হবে। এই সাড়ে পাঁচশ' বছরের

অগুণতি মানুষের কথা একটি সাময়িক পত্রের একটি সংখ্যায় বলা সম্ভব নয়। —তবে একটা সংক্ষিপ্তচিত্র আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ফুলিয়া সম্পর্কে ঘাদের জ্ঞান আরও তাদের পক্ষে সংখ্যাটি প্রয়োজনীয় এবং সহায়ক হবে বলেই মনে করি।

এ সংখ্যায় ষাঁরা লিখেছেন তাঁরা সবলেই কোন না কোন ভাবে ফুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা এখনও আছেন অনেকেই। শিল্পী নন্দলাল বসুরও একটা পরোক্ষ সংযোগ ছিল। তাঁরই ছাত্র শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষাঁর আজ দেশ জুড়ে খ্যাতি, তিনি প্রচুদ্র এঁকেছেন বর্তমান সংখ্যাটির, সাক্ষাৎকারে ফুলিয়ার কথা বলেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের ফুলিয়াকে তিনি আজও ভুলেননি কিন্তু যেটা দুঃখের তা' হলো ফুলিয়াবাসী তাঁকে ভুলে গেছে। এতে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি যদি কিছু হয়ে থাকে তো আমাদেরই হয়েছে। আমরা কাছে পেয়েও তাঁকে ধরে রাখতে পারিনি।

তাছাড়া এ সংখ্যা সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা যেমনি ১০৫ বছর বয়সের বৃদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তেমনি ৫ বছর বয়সের শিশুকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ছবিটা হাতে নিয়ে স্মিত্র এসে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো—‘আমার এ ছবিটা ছেপে দিয়ো।’

লেখকরা লিখে সহযোগিতা করেছেন। বিজ্ঞাপন দাতারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেকেই আমাদের বিভিন্ন কাজের সহযোগী হয়েছেন। বঙ্গুবর গণেশ রায় ছিলেন আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাঁর মত নিঃস্বার্থ কর্মী ইদানীংকালে খুব কমই মিলে। —সহযোগিতার অভাব দেখেছি শুধু সরকারী প্রশাসনে। স্থানীয় প্রশাসক তো কাগজের লোক দেখলেই হাতজোড় করে জেলা শাসকের দরজা দেখিয়ে দেন। জেলাশাসক ভেবে চিন্তে চুপচাপ থাকেন। কথা কিছু বলার চেয়ে না বলার ঝামেলা কমতো। তাঁর উপরের অবস্থাও তথৈবচ।

প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তা কিন্তু উপনগরীটিকে ক্রমশঃ অসুস্থতার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। এটা আজ বড় করে ভাববার বিষয়।

বন্দ্যলাল বসুৰ অপ্রকাশিত একটি ছবি ৩ চিঠি



স্বাক্ষরিত
"অবিস্মার" ১৭.২.৫২.

আমার, একটি চিঠি লিখা
২০লাইকিং "ফুলের"?

আমার মা দোলা চলে -
সেইদিন।

বাম ও ডান আমার
আমার মা (সেইদিন)
আমি ডান
আমি -

আমার মা
মা মা (সেইদিন)।

আমার মা মা মা

[ফুলিয়া নিবাসী শ্রীঅনিল কৰ্মকার ১৯৫৯ সাল নাগাদ
যখন ফুলিয়া পলিটেকনিকে আর্ট-এর ছাত্র ছিলেন, নিছক
কৌতুহল বশতঃই শাস্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুকে একটি চিঠি
লিখে বসেন। সঙ্গে একটি ফুলের ছবি ও একে পাঠান।
নন্দলাল বসু তাঁর স্বাভাবিক স্বভাব গুণেই চিঠির জবাব দেন এবং
নিজেও একটি ফুল একে পাঠান। ছবি এবং চিঠিটি এ
যাবৎ অপ্রকাশিত। চিঠিতে "রামের মা" অর্থাৎ প্রখ্যাত শিল্পী,
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা। চিঠি এবং ছবি শ্রীঅনিল কৰ্মকারের
সৌজ্ঞেয় প্রাপ্ত। —সঃ সাঃ সৈঃ]

কুন্তিবাসের আত্মকাহিনী

সুখময় মুখোপাধ্যায়

যে সমস্ত সূত্রে কুন্তিবাস সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র তাঁর আত্মকাহিনী। আজ অবধি ছটি পুথিতে এই আত্মকাহিনীটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গেছে:—

১) বদনগঞ্জের ৩৭২৭৮ নম্বর পুথি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ মাসে সেনা তাঁর ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’র প্রথম সংস্করণ (পৃ: ৬৭-৭১) এই পুথির আত্মকাহিনী অংশটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। পুথিটি এখন আর পাওয়া যায় না। এর লিপিকাল অজ্ঞাত।

২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত একটি ত্রিপত্র অসম্পূর্ণ পুথি। এই ত্রিপত্র অসম্পূর্ণ পুথিটি আসলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি আদিকাণ্ডের পুথির নিরুদ্দিষ্ট প্রথম তিন পাতা। ড: নলিনীকান্ত ভট্টাচার্যী ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে (পৃ: ৫৪৭-৫৫৬) এই পুথির আত্মকাহিনী অংশের নকল ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেন। এই পুথিটির লিপিকাল ১২৪০ বঙ্গাব্দের ২৮শে কার্তিক। এটিও বদনগঞ্জের পুথি; কারণ এর পুস্তিকায় লেখা আছে—“পঠনার্থে জীরঘুনাথ ভগত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ।”.....

পুথির পাঠ মিলিয়ে আত্মকাহিনী থেকে কুন্তিবাস সম্বন্ধে যা জানা যায়, তার একটি সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

কুন্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ নারসিংহ ওঝা বেদামুজ নামে একজন মহারাজার পাত্র বা পুত্র ছিলেন। নারসিংহের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। তিনি পরম সুখেই ছিলেন, কিন্তু সেদেশে প্রমাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরে চলে এলেন। জাহ্নবীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বসতি-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান খুঁজছিলেন, খুঁজতে রাত্রি সাহিত্য সৈকত

হয়ে গেল। তখন নারসিংহ সেখানেই শুয়ে পড়লেন। রাত্রি পোহাতে যখন এক প্রহর বাকী আছে, এমন সময় নারসিংহ হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনেতে পেলেন। কুকুরের ডাক শুনে তিনি চারদিকে তাকাচ্ছেন, এমন সময় একটি আকাশবাণী শোনা গেল। আকাশবাণীর আদেশে তিনি সেইখানেই বাস করতে লাগলেন। এই জায়গাটিতে আগে ফুলের মালক ছিল বলে তিনি জায়গাটির নাম রাখলেন ফুলিয়া।

ফুলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম চেপে গঙ্গা বয়ে যায়—গ্রামের মধ্যে ফুলিয়া বসত। ফুলিয়ায় বসতি-স্থাপনের পর নারসিংহের ঘর খন-খান্ড-পুত্র-পৌত্রে ভরে গেল। গর্ভেশ্বর নামে তাঁর একটি ছেলে হল। গর্ভেশ্বরের তিন ছেলে—মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাতটি ছেলে। বড় ছেলের নাম ভৈরব; রাজার সভায় তাঁর খুব সমাদর। মুরারির আর এক ছেলের নাম বনমালী। তিনি গাঙ্গুলি বংশে প্রথম বিবাহ করেন। এই বনমালীই কৃষ্ণিবাসের পিতা। কৃষ্ণিবাসের জননী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন; তাঁর গর্ভে দু'টি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কৃষ্ণিবাসের ভাইদের নাম মৃত্যঞ্জয়, শাস্তিনাথ, শ্রীধর, বলভদ্র এবং চতুর্ভূজ; চতুর্ভূজের আর এক নাম ভাস্কর। তাঁর একটি বৈরাট্রের বোনও ছিল। কৃষ্ণিবাসের ভাইয়েদের মধ্যে মৃত্যঞ্জয় ও শ্রীধর প্রায়ই উপবাস করতেন।

কৃষ্ণিবাসের বংশ কীর্তিমান পুরুষদের আবির্ভাবে ধন্য। সূর্য পণ্ডিতের ছেলের নাম বিভাকর; তিনি বাপের মতই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। সূর্যের আর এক ছেলে নিশাপতির বাড়ীতে এক হাজার লোক থাকত; তিনি রাজা গোড়েশ্বরের কাছ থেকে একটি ঘোড়া এবং তাঁর পাত্রমিত্রদের কাছে “খাসা জোড়া” উপহার পেয়েছিলেন। গোবিন্দের ছেলে আদিত্য, তাঁর ছেলের নাম বিজ্ঞাপতি ও রুদ্র। ভৈরবের ছেলে গঙ্গপতি ও বিষ্ণুতীর্থে, তাঁর কীর্তি বারানসী পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছিল। কৃষ্ণিবাসের বংশ কুল, শীল, ঐশ্বর্য, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি গুণে সমৃদ্ধ ছিল এবং ব্রাহ্মণ ও সজ্জনরা তার আচার অনুকরণ করতেন।

পুণ্য মাঘ মাসের জ্যৈষ্ঠমী তিথিতে রবিবারে কুন্তিবাসের জন্ম হয় জন্মের পর তাঁর পিতা (বা পিতামহ) উত্তম বস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোলে নেন । তখনও তাঁর পিতামহ জীবিত ছিলেন ; তিনিই নবজাত পৌত্রের নাম রাখেন কুন্তিবাস ।

বারো বছর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তিবাসের উচ্চশিক্ষার সুরূ হয় । বিভিন্ন স্থানে পড়ে কুন্তিবাস সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন । উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে তাঁর পাঠ সমাপ্ত হয় । বিজ্ঞানাসক্তের পর গুরুর কাছে অনেক প্রশংসা লাভ করে কুন্তিবাস বিদায় নেন ।

এর পর কুন্তিবাস রাজা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করেন । ‘সপ্তমষ্টি বেলা’য় (অর্থাৎ সকাল সাড়ে ন’টার মত সময়ে) কবি রাজদর্শন পান । সোনার লাঠি হাতে একজন দূত এসে কবিকে রাজ্যের কাছে নিয়ে যান । রাজপ্রাসাদের ন’টি দেউড়ি বা “বৃহন্দ” পার হয়ে গিয়ে কুন্তিবাস দেখেন প্রাসাদের আঙিনায় রাজ্যের সভা বসেছে । রাজা সেখানে বসে আছেন, পাত্রমিত্রদের সঙ্গে পরিহাস করছেন । তাঁর ডাইনে পাত্র জগদানন্দ, পিছনে ব্রাহ্মা সুনন্দ । এহাড়া, রাজ্যের ডাইনে ও বাঁয়ে কেদার খাঁ, নারায়ণ, গন্ধর্ব-অবতার (সঙ্গীতজ্ঞ) গন্ধর্ব রায়, কেদার রায়, তরলী বা তরলী, ধর্মাবিকারিন্ জীবৎশু, রাজপণ্ডিত মুকুন্দ প্রভৃতি সভাসদরা বসে আছেন , তিনজন পাত্র রাজ্যের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ; রাজ্যের সামনেও অনেক দাঁড়িয়ে রয়েছে । চারদিকে নাট্য-গীত—সমস্ত লোকে হাসছে । রাজ্যের প্রাসাদে চারদিকেই ছুটোছুটি । আঙিনার উপর “রাঙা মাজুরি” বিছিয়ে, তার উপর “পাট নেত তুলি” পেতে, মাথার উপর চাঁদোয়া খাটিয়ে এই সভা বসেছে । এখানে বসে রাজা মাঘ মাসের বোদ পোহাচ্ছেন । কুন্তিবাস রাজ্যের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রাজা তাঁকে হাতের ইশারায় ডাকলেন । পাত্ররাও উচ্চকণ্ঠে জানালেন যে, রাজা ডাকচেন । কুন্তিবাস রাজ্যের সামনে গিয়ে তাঁর চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে রাজ্যকে অরচিত সাতটি শ্লোক পড়ে শোনালেন । নানা ছন্দে রচিত রসাল শ্লোকগুলি শুনে

গৌড়েশ্বর কবির দিকে চাইলেন। অত্যন্ত খুশি হয়ে তিনি কবিকে ফুলের মালা উপহার দিলেন। রাজসভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢেলে দিলেন। কবি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পাটের পাছড়াও উপহার পেলেন। গৌড়েশ্বর বললেন, “কী দান করব?” পাত্রমিত্ররা বললেন, “আপনি একে সম্মানিত করলেন। পঞ্চগৌড়ের রাজা যখন গুণের পূজা করেন, তখনই হয় সত্যকার পূজা।” পাত্রমিত্রেরা কৃত্তিবাস বললেন, “যেখানে আমি ঘাই না কেন, গৌরবই আমার সমূল। কারও কাছ থেকে আমি কিছু নিই না। রাজা আমাকে অর্থ দিতে চাইছেন, কিন্তু অর্থ আমি নেব না, গৌরবই আমার কাম্য। সংসারে যত মহাপণ্ডিত রয়েছেন, কেউ আমার কবিত্বের নিন্দা করতে পারেন না।”

রাজার প্রাসাদ পেয়ে কবি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। কবির রাজসংবর্ধনাকে “অপূর্ব” জ্ঞান করে লোকে তাঁকে দেখবার জন্মে ছুটেতে লাগল। চন্দনে ভূষিত কবিকে দেখে জনতা আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল, “ধন্য! ধন্য! মুনিদের মধ্যে বাঙ্গালীকি শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতদের মধ্যে তেমনি কৃত্তিবাস শ্রেষ্ঠ।” এর পর কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। আত্মকাহিনীর বাকী অংশ জনতার মুখে আরোপিত কৃত্তিবাসের স্বরচিত প্রশস্তি।

[ভারবি প্রকাশিত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ থেকে গৃহীত]

PHULIA-WAS IT A DREAM ?

S. K. Dey

[In the middle of May, 1982 we wrote a letter to Mr. S. K. Dey (the author of this article and former Union Cabinet Minister for Community Development) with a request to contribute an article on Phulia Township for our Magazine.

Accordingly, on the 16th June, '82 Mr. Dey sent us this article for our Phulia special number which was announced to be published in August '82. But due to some unavoidable circumstances this has been delayed to publish. Keeping it to our knowledge, the article has been published in the Statesman, Calcutta Publication on 22-8-82 with a bit change.

Though our magazine, the Sahitya Saikat is of Bengali language this article has not been translated only to keep its originality and to maintain the force of the article—E.S S]

The historic mass exodus in the wake of August 15, 1947 was taking its logical new course by 1950. The people of the North had acquired the strength, initiative and instinct to survive against the gruesome invasions from the North - west into India repeating successively at every age ever since the dawn of our history. Life militated against their intellect running surfeit

and working havoc with them. Instead, Providence lent them a fund of intelligence such as could ever avail them of common sense. Relief offered by Government to the new citizens from West Pakistan was already tending therefore to turn increasingly towards rehabilitation.

The newly created state of East Pakistan in what was erstwhile East Bengal had been rather a tame contrast to what happened in West Pakistan. With a relatively slow exodus flowing smoothly, East Pakistan had been incredibly quiet, even though a buzzing new state. But this militated against the "two nation" theory. Inspiration had to flow from the west to the east. 1950 opened out with a sudden mass exodus from the east towards India, even though it had very little of the violence that had rocked the situation earlier in West Pakistan and East Punjab. A sudden sense of insecurity, threats of violence, artificially engineered, brought about the new trend. The centuries old traditions of Hindu and Muslim religion and culture blended and practised by both began undergoing subtle changes with the new impact of fundamentalism on the erstwhile secularism that had ruled through the ages. No wonder, the trickles of migration turned into massive flows overnight.

Prime Minister Nehru's visit to Calcutta and the nearest frontiers towards East Pakistan brought in a ray of hope. Nehru Liaquat Pact followed. The panic began to taper down. But the virtual one way traffic of people towards India continued. The myth persisted however in India that there would be free two-way traffic restored between East Pakistan and her India Neighbours, sooner or later, a total illusion as later times and events followed to confirm. At Nehru's instance, Dr. B. C. Roy, the Chief Minister, and the father figure in West Bengal, accepted the concept of an experiment conducted at Nilokheri with Nehru's close guidance, in erstwhile East Punjab for the rehabilitation of displaced persons. It was to secure gainful employment following appropriate training, as the primary nucleus, with housing rated as a secondary feature to be carried out by the people themselves with such assistance as they needed from Government in money, materials and technical expertise.

The author who had conceived of and implemented the Nilokheri programme, was asked to select a site for a like project in West Bengal and supervise it. With a weapons-carrier as the transport provided by the West Bengal Government and with appropriate officers from the State Rehabilitation department, a search followed in District after District.

Phulia, ten miles beyond Ranaghat in the district of Nadia, became the site of the Rural cum Urban new Township to house and rehabilitate a section of the displaced people who were willing to settle down with work as the means of living as top priority. The loans coming to their share of the new homes to be built by them initially with Government loan and aid were to be paid back to Government on a no profit-no loss basis.

A competent Engineer Mr. P. Guha Thakurta was appointed the administrator of the Phulia colony. A young agricultural graduate, Prasanta Mazumdar, was selected for appointment to the colony as the officer in charge of agriculture and allied subjects out of the government department of agriculture in West Bengal. Prasanta Mazumdar was a person of outstanding qualities who had later joined the Indian Administrative Service. The running of an agricultural School at phulia for Bhadrakolk children in the colony later upgraded to an agricultural Extension Training Centre under the Community Development programme, conversion of once riverine land at phulia to full scale modern agricultural operation, transformation of some of the highest caste Brahmins and Kayastha displaced persons as buzzing vital farmers were the blossoms that flowered out of his youthful genius. It is sad,

Mazumdar passed away ailing from cancer, very prematurely, as Vice Chancellor of the Assam Agricultural University to which he had been assigned after he had served as the Head of the department of agriculture over years in Assam.

A Vocational Training Centre cum polytechnic was started to provide training to young men and women in skills and motivation with hand : workshops in the various sectors demanded by housing, electric and sanitary system for the colony as a whole, provided a parallel development virtually unknown theretofore in its tempo, excellence and character in a rural setting. Women's and children's programme in rural arts and crafts especially weaving, contributed to wages earned by people and to add flavour to the aesthetic part of life at phulia. Song, drama and music which come naturally to East Bengalees found their outlet with spontaneity. Schools for displaced children, facilities for health and medicine followed as inevitable corollaries. Roads and Lanes were built for easy communications. The advent of the new nation wide programme of Community Development early in 1952 found its natural sequel as anticipated, in Phulia becoming the headquarters of the C. D Block with all technical services of Government established there. This involved the villages

surrounding the new built township which had been designed to act as the service centre for the villages in a relationship of reciprocity between the rural and the urban. The Block Development officer became the new administrator of the township integrating the administration with that of the West Bengal Government, while the special contributions from the Rehabilitation Ministry continued to flow to the township through the State Government. A number of private Industries based on controlled material especially cloth, yarns, steel etc apart from a milk collection and processing centre on behalf of the west Bengal Government came to be established as the new growth centres. Even a thriving Bazar was established in between the trunk road and the Township.

One should now look at the political and social front then growing at Phulia and what obtained at Nilokheri then in East Punjab from which had flowed the original inspiration. Nilokheri citizens who hailed from west Punjab and the north west frontier Province had no politics or social conflicts to disturb their new course of life. The government of East Punjab hardly mattered. The opposition parties, if at all, kept Nilokheri out of their purview. Nilokheri citizens naturally had free play of energy and skill to build a secure foundation for themselves.

Agriculture formed a vital core of the Economy apart from weaving and many a mechanical trade and manufacture on small scales, which are the characteristics throughout East Punjab as a new revolution. In West Bengal to the contrary, there was a rule of the "Bhadraloks" who were interested more in jobs in Government or private trade, commerce and industries and laterally in sucking cream out of absentee sharecropped land holdings in the countryside. The communist parties constituted the main opposition. To the members of this community, congress rule was a poison that must be resisted tooth and nail. Rural areas just did not exist for them except for purposes of political polemics. The concept of the rural cum urban township as a growth centre went diametrically opposed to what communists borrowed then from abroad as the hymns of their political Vedas. As a result there came opposition to every phase of development, economic or social. Indeed the author who held the operative charge of the township, was barricaded in his office at phulia late one evening with threats of dire consequences.

The author asked the hordes not to disturb him at his work in their service. He was asked by a red eyed young man, if it were not true that he had lifted the hand of a striking woman at the gate of the polytechnic, when the citizens

had declared it a day of strike. The author declared quietly that he did, and he was sorry he had not given a few slaps on her cheeks as he would have, in a like case done to a stupid sister of his. "So you call her a sister?" the young man retorted. "Nay more," the author said and added, "I have accepted you all as my children whose care I have made a point of honour. I am here alone. No police anywhere near, and I promise, I would not report to the police were you even to break my bones, all of you pouncing on me together. Go ahead, the road is open for you to do your worst, knowing as I promise, I will struggle on and on, to do my best for you." Somehow, there followed some consternation, for all plans of theirs went away. As the discontent continued to simmer in silence, the author went on an unending fast by himself from the evening onwards. Came the puja holidays. On the fourth day of the fast, the people came together and asked the author to forgive them and have food and they would never have a strike against him again. A glass of orange juice was offered to him by the most aggressive woman volunteer. The township proceeded ahead. But new developments towards community projects switched the author forwards towards other channels and he got ultimately disengaged from

direct responsibility as regards Phulia Township.

While the same situation minus Politics, obtained at Nilokheri the township today has a population of over fifteen thousand and is acting as the headquarters likewise of the community development block. In the northern part of India, the people forge ahead, "inspite of the Government." Reclaimed land ranging to around six hundred acres is 100% under tube well irrigation, organised by the farmers themselves under co-operative management. The intensity of cultivation is more than 200%. An acre of land here yields an average of 45 mds of wheat and about 53 mds of rice apart from green fodder for animals. The unlettered frontier people who now work as farmers after some training have a minimum net income of Rs. 15,000 out of six acres of land, and there is hardly a boy or a girl who is not a graduate or an M. A. The Polytechnic has 3 hostels instead of one that was created earlier. The Primary, middle and high schools are overflowing with students. The printing press run by the Central Government which had 35 employees in early fifties has six hundred employees working in three shifts. A mandi (market) has grown overflowing with harvests from the surrounding countryside under the green revolution. Unemployment is unknown at Nilokheri. There is

hardly any illness although the primary health centre has 30 beds fully equipped with personnel, equipment and medicines looking after the Block as a whole. The agricultural production at Nilokheri is around 300% of what obtains per acre today in West Bengal. There are temples of all kinds including Gurudwars built up by people themselves co-existing, totally free of mutual discord. Around 100% of the children in the colony are in schools which are bursting on the seams. The Polytechnics produce diploma holders in civil, mechanical and Electrical Engineering. The product of the institution can be found all across the country eventually holding Executive, superintending and Chief Engineers' position in Government and non Government institutions not unoften. Agricultural land allotted at Rs. 600 per acre and houses for Rs. 6000/- each in 1952 are selling now respectively for Rs. 50,000 to Rs. 60,000 per acre and houses for Rs. 150,000 when these change hands on rare occasions.

Citizens of West Bengal still hold their head high intellectually, especially when they function away from West Bengal. It is however strange that fish which is the primary food for Bengalees have to be imported by Calcutta from as far as Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh while experts in fisheries in West Bengal, are by far

ahead of the rest of India in both the science and technology of fishery. Both sides of the road between Calcutta and far lying areas in the north produce through displaced persons fresh vegetables flooding the Calcutta market as never before. The area of Phu ia is a less than two hours drive from the heart of Calcutta connected alongside by Railways. It is curious that with a high sub-soil water level, this area should not produce fruit, vegetable and milk which as industries could play a dominant role in boosing the economy to an envy of others. Why should the Polytechnic at Phulia lie virtually closed just because the Government of West Bengal has yet to implement the grading of this to the I I. T. level, to which they are said to be pledged for a number of years? With the sudden passing of Dr. B. C. Roy, the writers building, the most consolidated of the bastions of erstwhile British Raj, became a bazar where the ministers, total urbanites, never used to administration in the real sense of the term, created but cross currents of confusion at work. The seasoned bureaucrats mastercraftsmen in polemics on paper found even this vocation at disarray. Followed communist rule "first phase" after an interregnum of musical chairs at play.

The great, great grandchildren left behind

as 'Thikedars' by Lord Clive were not easy to dislodge. Foll wed violence of a kind politically, which hardly had a parallel anywhere else in India. The new Communist Party CPI (M) also had to learn the lesson by themselves that West Bengal had some areas outside the metropolis of Calcutta wherein the major population dwelt as bondage to the never ending appetite of Calcutta. No wonder, Thikedar Raj embodied congenitally in the congress Raj followed. But it could hardly last long even with the talisman of "Garibi Hatao" and the thugs and mafias that gathered to pick Indira Gandhi's resilient pocket. C.P.I. (M) rule followed again soon but this time with a "Kaya Kalp" determination to concentrate on the countryside even in defiance of the denizens of the "Writers Building" and its "satellites". The party this time concentrated in right earnest, as an appropriate contrast to the communist ideology heretofore, on the "Bargadars" (Share croppers) who had shagged for centuries with a host of Thikedars in between, who constitute the bulk of the socalled Bhadrolok of Calcutta, whether in Politics, administration or in Commerce. Work has followed in the countryside, compared to which, 'land reforms' in congress ruled states in India will rank as hypocrisy and parody. The struggle of the CP. (M) government to confer

real power on panchayats and their higher Tiers despite the gravitation of the bureaucrats and the congress oligarchs earlier in power, is to be seen to be believed. The recent elections in West Bengal, demonstrate, if any demonstrations were called for at all, as to how the state wide record in elections in the countryside stand as a contrast to the Thikadars ruled city of Calcutta, whom the city has returned and who have been thrown out. The vulgarity of the opposition, bordering on obscenity, towards the Governor who opened the new assembly session offers a tale too painful for words.

It is really a paradox that on such a background, with a government committed to the people lock-stock and barrel and determined to belong to the "Janata" rather than to the "Bhadralok" clan, Phulia should suffer lack of support and assistance. Have they been lost totally in the labyrinth of the long interregnum' forgetful of the triple tenets of faith.

"Muscles can do it"

"Muscles can be trained to do it"

"Conditions can be created to do it"

and

The triple charter of rights :

“The right to live”

“The right to work for a living”

“The right to receive what is earned”

that constituted the birth pangs through which Phulia had her baptism. Or is it that they too have taken an about turn towards the class of ‘Bhadra Loks’, they were pledged to eschew earlier? There is a case here for heart searching.

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্ভাভব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

- ১। প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া।
- ২। প্রকাশ কাল : ত্রৈমাসিক
- ৩। প্রকাশক : শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য
ও মুদ্রাকর : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া।
- ৪। নাগরিক : ভারতীয়
- ৫। সম্পাদক : শ্রীমাধব ভট্টাচার্য (অবৈতনিক),
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈঁচা, নদীয়া
- ৬। নাগরিক : ভারতীয়
- ৭। মালিকানা : সাহিত্য সৈকত পরিচালক মণ্ডলী
- ৮। মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

আমি শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার স্ভাভব্য ও বিশ্বাস মত সত্য।

স্বাঃ কাকলি ভট্টাচার্য

প্রকাশক

তারিখ—২৫/৫/৮৩

ফুলিয়া শহরের বুনিয়াদটা অবৈক দৃঢ় করে লাগানো হয়েছিল

এস. কে. দে

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি হয়ে ঐযুক্ত এস. কে. দে ফুলিয়া এসেছিলেন গত ১৬/১১/৮২। ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন প্রাঙ্গণে ফুলিয়া বাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের অংশ বিশেষ এখানে ছাপা হলো। -সঃ সাঃ সৈঃ।]

বক্তৃতা দেওয়া বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ১৬ হাজার বার বক্তৃতা দিয়েছি সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে।

বক্তৃতা দিয়ে যদি ভারতবর্ষকে উন্নত করা যেতো তা হলে মনে হয় এই দেশের মত উন্নতশীল দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। কেননা, বক্তৃতার রাজ্যে পৃথিবীর সব দেশকে আমার মনে হয় আমরা হারাতে পেরেছি। সুতরাং আমি অনেক চিন্তা করে স্থির করলাম যে, না আর বক্তৃতা না। প্রয়োজন হয়, লোকের সাথে বিচার বিনিময় করা। সেটা বক্তৃতা দিয়ে হয় না। ঝট করে বক্তৃতা দেয়া-এটা রোগ হয়ে দাঁড়ায় কেননা, যিনি বক্তৃতা দেন তিনি উপদেশ দিয়ে চলে যান ভাবেন সেই উপদেশগুলো বীজের মতো। তার থেকে ফসল ফলবে। সে হয় না। বিচার বিনিময়ের মাধ্যমে সেটা হওয়া সম্ভব এবং বিচার বিনিময় সব সময় প্রয়োজন।

আপনাদের এখানে কেন এসেছি? শুধু ফুলিয়াতে কী হচ্ছে, ফুলিয়ার লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করব নিতান্তই তা নয়। আমাদের ৩০/৩১ বছর আগে জানতাম তাঁদের অনেকেই চলে গেছেন।

আমি আমার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়েছি। বসে বসে লিখি। চিন্তা করি। ভাবি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ চিন্তা করা যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় সেও একটা উপযুক্ত বায়ু মণ্ডল সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক হয়।

আপনাদের বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আমাকে হঠাৎ একেবারে আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে নেমন্তন্ন পাঠালেন যে তাঁরা সরকারী সামর্থ্য, শক্তি, অধিকার যা আছে যতটুকু সম্ভব-লোক নিজে পায়ে সংগঠিতভাবে নিঃস্বার্থভাবে লোকের হিতের জন্য চালাবে এইটা সরকার করতে চান।

আশ্চর্য! আজকের পরিস্থিতিতে, পৃথিবীর পরিস্থিতিতে কম্যুনিষ্ট সরকারের তরফ থেকে যারা সর্বদা এটা বিশ্বাস করে এসেছেন অতীতে লেনিন যা বলেছেন ভবিষ্যতে সেই লেনিনের কথাতে বিশ্লেষণ করলে তাকে জবাব পাওয়া যাবে, তাদের পক্ষ থেকে এই চিন্তা করা যা এমন একজন লোককে ডাকা দরকার যার এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। কিছু কাজ করার ইচ্ছা আছে, মন আছে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে যার রাজনৈতিক কোক সংস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই সেই লোকটাকে ডেকে বলা তুমি এই বাংলাদেশের কলকাতা থেকে নর্থবেঙ্গল পর্যন্ত যাও, লোকের সঙ্গে কথা বল লোক কী বলছে না বলছে দেখ, লোক কী করছে না করছে দেখ। সরকারী কর্মচারীরা কী করছে! সাহায্য দিচ্ছে না তার মধ্যে বাধা দিচ্ছে এইটা দেখ।—দেখে আমাদের বল তুমি কী দেখলে, কী হচ্ছে এবং তোমার মতে, তোমার অভিজ্ঞতাতে।

আজকের পরিস্থিতিতে ওয়েস্টবেঙ্গল যেখানে একটা কম্যুনিষ্ট সরকার রাজত্ব করছেন আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে অস্ফাল্ট পার্টি রাজত্ব করছেন তাদের মতিগতি স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন এই পথে যাচ্ছে অন্যজন এ পথে যাচ্ছে কিন্তু দু'দলই বলছে পৃথিবীর লোকের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদছে। কী বলবো! সেই লোকের জন্যে কোথায় যে তাদের কাঁদা! সেটা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকার কী আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার গজার আওয়াজ কার বেশী আর বজ্রতার মধ্যে কার সাহায্য বেশী বলা কঠিন। সুতরাং সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

এই দেশে যদি বেঁচে থাকতে হয়, যদি অগ্রসর হতে হয় তা' হলে এই গ্রামগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। গ্রামগুলোকে

পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ এই নয় সরকার নিজের টাকা দিয়ে কিম্বা
অন্যদেশ থেকে ধার করা টাকায় রাস্তা বানানো, হাসপাতাল
বানানো, লোকের ঘর বানানো এ নয়। পুনরুজ্জীবিত করা মানে
জীবন্তলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই দেশের পুরুষ স্ত্রী
ছেলে মেয়ে সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তাদের মধ্যে প্রাণ
প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সঙ্গতির পথ করতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে
হবে তাদের সব জিনিষ শিখাতে হবে। এমন কী নিজের
ভবিষ্যতের জ্ঞান তাঁদের মধ্যে ইচ্ছা এবং সংকল্প সৃষ্টি করতে হবে।

আমি ৩০ বছর পরে এসেছি। বানাঘাট ছাড়ার পর
ফুলিয়ার কাছাকাছি আসতে দেখলাম দু'দিকে কৃষি প্রণালীর বলা
ষায় অসাধারণ রকম উন্নতি হয়েছে আগের তুলনায়। একটা
ভুল হয়েছে। এই মিটিং করার আগে আমাকে যদি এই শহরটা
১৫/২০ মিনিট ঘুরে দেখানো হতো তা হলে আমি বুঝতে পারতাম
কী হচ্ছে না হচ্ছে।

আমাকে ৬ মাস আগে এখান থেকে এক স্তম্ভলোক বলেছিলেন
পলিটেকনিক বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের থেকে যদি অভিযোগ
থাকে আমাদের এখানে ট্রেনিং এর ভাল ব্যবস্থা নেই কিম্বা ঝাঁরা
teachers তাঁরা খুব দক্ষ লোক নন, শিখাতে পারছেন না তাহলে
তা' আমি বলতে পারি কিন্তু ট্রেনিং সেক্টরকে Polytechnic
বলা হয় I. T. I. বলা হয় না সে জ্ঞান তাঁরা Strike করেছে এবং
৩ বছর বন্ধ আছে। বুঝিনা! এর অর্থ আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান
আমার মনের মধ্যে এর কোন develope হয়না।

এখানে বাইরে থেকে যা দেখলাম, বাড়ীগুলোর দিকে যেন
কারো দৃষ্টি নেই, নোংরা। বাড়ীগুলো যেন নিজেদের মনে হয়না।
সরকার হয়তো কাগজে কলমে বাড়ীগুলো আপনাদের দেন নাই
যদি না দিয়ে থাকে তাহলে কাগজে প্রমাণ দরকার। এই নিয়ে
আলোচনা হওয়া দরকার। আপনাদের সরকার আমায় এনেছেন
বললাম আমি ওকালতী করতে রাজী আছি কিন্তু বিষয় জানা
দরকার। আপনাদেরকে বলতে হবে এই জিনিসগুলো করা

দরকার, বলতে হবে আপনাদের তরফ থেকে। বলতে হবে এইগুলো যদি করা হয় তবে সাংঘাতিক ভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারি এই শহরে।

আপনারা যারা যিনি B. D. O. আছেন Adviser আছেন, পঞ্চায়েতের President আছেন তাঁদের বর্তব্য এগুলো অভিযোগ করা প্রয়োজন হলে আপনারা আন্দোলন করতে পারেন। সমাজটাকে উন্নত করার জন্য যে চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার জন্য যদি আন্দোলন করতে হয় তা করবেন।

আমি জানিনা আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি কী ব্যাপারটা কী? রোগটা কী? ঔষধটা কী করে বাংলাতে পারি বলুন। গোলমালটা কী? আপনাদের এই শহরের জমি, বাড়ী, রাস্তা দোকান পাশখানা কী গোলমালটা কোথায়। এই মেয়েদের দেখে আমার ভাল লাগছে। এদের মধ্যে একটা শ্রাণ আছে, মেয়েদের মধ্যে অসাধারণ শক্তি সেই কারণেই পৃথিবীটা বেঁচে আছে। কী চাই জানিনা। সে সম্পর্কে আপনাদের একটু চিন্তা করা দরকার। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এর আগে বা পরে আপনাদের সঙ্গে বসতে রাজী আছি যতক্ষণ চান। আমি যখন ফিরে যাব আপনাদের সরকারের কাছে তখন এর কথা লিখে ওদের কাছে দিয়ে রাখতে পারি। গভর্ণরকে ডাকতে বলেছিলাম। গভর্ণরের এইখানে আসার একটা অর্থ আছে, ব্যক্তিগত হিসাবে আমার এইখানে আসার কোন অর্থ নেই।

আমি আপনাদের কী করতে পারি? শুধু ওকালতী করতে পারি। Fees কিছু লাগবে না শুধু সময় একটু লাগবে, চিন্তা করতে হবে কী বিষয় নিয়ে আমি ওকালতী করবো।

আপনাদের এই ফুলিয়া শহরের পত্তনটা, বুনিয়াদটা অনেক দৃঢ় কবে লাগানো হয়েছিল তার পেছনে যা কল্পনা ছিল তার মধ্যে ত্রুটি কিছুই ছিলনা এবং যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক দক্ষ লোক এই কাজে আপনাদের সহায়তা করেছেন, এঁদের দিয়ে সকল যদি তেমন না হয় সেইটা ওঁদের দোষ নয়, সেইটা সবচেয়ে বেশী দোষ এই শহরে যারা বাস করছেন আজ তাদের সম্মিলিত বুদ্ধি এবং শক্তির অভাব। সম্মিলিত বুদ্ধি এবং শক্তি যদি একত্রিত হয়ে আপনারা চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের সেইকাজ সকলতা দেবে এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

জীবনে যদি সবচেয়ে শক্ত কোব প্রফেশন থাকে সেটা হলো শিক্ষকতা

রামানন্দ বঙ্গোপাধ্যায়

[পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে]

ফুলিয়াতে আমি যাই ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে। ফুলিয়া আমার বিশেষ করে মনে আছে এই কারণে, আমার চাকরীটা এমন একটা দিনে শুরু করেছিলাম সেই তারিখটা। সচরাচর এই তারিখটা আমাদের এখানে খুব রহস্য করেই বলে আর কি-পয়লা এপ্রিল।

নন্দলাল বসুর ছাত্র ছিলাম। শান্তিনিকেতনেই একটা পার্টটাইম কাজ করছিলাম। ওখান থেকেই নন্দলাল বসু পাঠালেন ফুলিয়াতে। ফুলিয়াতে লোক দরকার ছিল। ফুলিয়ার চাকরীটা আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য ষটিয়েছে।

ফুলিয়াতে প্রথম গিয়ে আমার খুব খারাপ মনে হয়নি। তবে ছাড়া ছাড়া অনেক ঘরবাড়ী, বাঁধন ছিলনা। যখন আমি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষক হয়ে গেলাম আমার বয়স খুব কম ছিল। সচরাচর ওখানে যারা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের শিক্ষকতার একটা কড়া পড়ে গেছিল। আমি যখন শিক্ষক হয়ে গেলাম তখন খাতা পত্রে শিক্ষক হলেও ছাত্রের যে মনোবৃত্তি এবং উৎসাহ চেতনা তা আমার চলে যায়নি। এখনও যায়নি, তখন প্রবল ছিল।

ফুলিয়াতে আমি গিয়ে যখন পৌঁছালাম তখন আমার মনে হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটার পরিচ্ছন্নতা নেই বলে।—আর একজন মানুষ ছিলেন তার অনেক বয়স ছিল তিনি ছিলেন মনিমোহন অধিকারী। একই ঘরে দু'জনে ছিলাম। তিনি মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। আমি ছিলাম কমার্শিয়াল আর্ট ডিপার্টমেন্টে। আমার বিভাগে ছিল ১৬ জন ছাত্র তাঁর ছিল বোধহয় ৩২ জন। এই ৪৮ জন ছাত্র নিয়ে প্রথমে আমরা পুরো

প্রতিষ্ঠানটি পরিষ্কার করার কাজে লাগলাম। কিছু বিক্রপ হলো।
 যে দিন প্রতিষ্ঠানটি পরিষ্কার করে আমরা উদ্বোধন করলাম সেদিন
 ছিল ২৫শে বৈশাখ-রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। সেখানে আমি
 রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি গড়েছিলাম। জানিনা আজ আছে
 কীনা! এছাড়া আমি একটি মুরাল করেছিলাম সেটাও আছে
 কী নেই জানিনা।

এই মুরালটা করার পেছনে নন্দলাল বসুর যিনি আমার
 মাষ্টারমশাই ছিলেন তাঁর অসম্ভব উৎসাহ ছিল। তিনি আমাকে
 চিঠি লিখে বোঝাতেন। এ বিষয়ে তিনি আমাকে চিঠি লিখে
 জানাতেন কোথায় কী হবে না হবে। ফুলিয়াতে থাকাকালীন
 ড্রয়িং করে আমি শক্তিনিকেতন নিয়ে আসতাম, তাঁকে দেখাতাম।
 তিনি আমাকে বোঝাতেন। ঠিক করে দিতেন। বলতেন তুমি
 নদীয়া জেলাতে আছ, চৈতন্য দেবের ওটাই তো লীলাক্ষেত্র।
 ওখানকার ঘরবাড়ী মানুষজন, গাছপালা এসব দেখবে কেননা
 ঐখানকার পরিবেশেই উনার জীবন তৈরী হয়েছিল। সুতরাং তাঁর
 জীবনী আঁকতে গেলে ওখানকার পরিবেশের কথা মনে রাখতে
 হবে। ওখানে উঠোনে কেমন হয়, তুলসীমঞ্চ কেমন হয় এগুলো
 মাষ্টার মশাই প্রায়ই আমাকে লিখে পাঠাতেন। ফুলিয়ার সঙ্গে
 আমার সম্পর্ক কেবল চাকরীর ছিলনা। আমি গ্রামে গ্রামে
 ঘুরতাম। ফুলিয়ার বৈচা যেখানটায় আপনারা পত্রিকা করেছেন,
 তারপর কুস্তিবাস ভিটের, গঙ্গা পেরিয়ে গুপ্তিপাড়ায় গেছি।
 প্রায়ই আমরা বেরিয়ে পড়তাম ছাত্রদের নিয়ে। এই যে প্রায়শই
 বেরিয়ে পড়া এটা আমি আমার মাষ্টার মশাইয়ের কাছ থেকে
 পেয়েছিলাম। ওখানে এরকম প্রচলন দেখিনি। মাষ্টারমশাই
 এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা আড়াল ছিল, দেওয়াল ছিল। আমি
 সেটা খানিকটা ভাঙতে পেরেছিলাম।

ফুলিয়ার একটা জিনিস আমার খুব মজার লাগতো—চোখ
 বুজলে এখনও দেখতে পাই, ঐ অঞ্চলে যারা বসতি স্থাপন
 করেছিলেন তারা ঐ অঞ্চলটাকে কেমন করে যেন পূর্ববঙ্গ বানিয়ে
 ফেলেছিলেন।—তা' সত্যি দেখবার জিনিস। পশ্চিমবঙ্গের

অমিতে পূর্ববঙ্গের যে একটা আওতা এনে দেয়া এই প্রবণতাটা আমার খুব মজার লাগতো আমি তো পশ্চিমবঙ্গের ছেলে কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে মজা তা এখন বুঝতে পারি। উঠোন নিকানো আলপনা দেওয়া, গান গাওয়া, রান্নার ধরণ ধারণ এগুলো আমার খুব ভাল লাগতো। ফুলিয়াতে ত'বছর থাকটা আমার ছবির জীবনে খুব উপকার হয়েছে। বিশেষতঃ ছাত্রদের সঙ্গে মেলা মেলাটা আমাকে মস্ত বড় করে দিয়েছে। মস্ত বড় করে দিয়েছে মানে আমাকে একটা পথ করে দিয়েছে।

এখনও পর্বস্তু আমার যত ছাত্র বেরিয়েছে সকলের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ রয়েছে। একটি সাধারণ ঘটনা বলি।—একদিন গোলপার্ক হেঁটে যাচ্ছি একটি ছেলে আমার এসে প্রণাম করলো, এখন আর ছেলে বলবনা ২০ বছর আগের ছাত্র, আমি বললাম তুমি স্ত্রীবোধ না। স্ত্রীবোধ আমার কাছে ছবি আঁকা শিখেছিল। এখন সে বাসের কনডাক্টর। মানুষের তো পথের ঠিক থাকেনা। সে সংকোচ বোধ করছিল, বললো মাষ্টারমশাই, আমি তো আর ছবি আঁকতে পারছি না। আমি বললাম 'তাতে কি হয়েছে! এল ৯ বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি আর ও কথা বলছিলাম। আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওর সহকর্মীরাও এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। আমি ওকে ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওর মা-বোনের কথাও জানতে চাইলাম। ওর বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন। ওর সহকর্মীরা আমাকে বললো—জানেন মাষ্টারমশাই, এই স্ত্রীবোধবাবু হচ্ছেন আমাদের স্টেট ট্রান্সপোর্টের কলকাতার সবচেয়ে সং এবং কর্মনিষ্ঠ কর্মী। এটা মস্ত বড় পাওয়া আমার কাছে। স্ত্রীবোধের সহকর্মীরা স্ত্রীবোধকে বলছে ওর মত সংলোক নেই। ছবি আঁকার পূর্ণ মূল্যটা তো আমার ঐখানেই পেয়েছি। ছাত্রদের সঙ্গে এই সম্পর্কটা আমার মুছে যায়নি। এখনও ওরা আসে, জী-বাচ্চা নিয়ে আসে, চিঠি পত্র লিখে। চিঠির উত্তর না দিলে ওদের অভিমান হয়। ওরা তো আমাকে ২০ বছর আগেকার রামানন্দ হিসাবে পেতে চায়।

ফুলিয়াতে অনিল বলে একটি ছাত্র এখনও আছে। এখন আপনারা যেমন সাহিত্য চর্চা করছেন সে সময় এরকম কিছু ছিলনা। আমরা কয়েকজন মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ইত্যাদি করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পত্র পত্রিকা করার কোন চেষ্টা করিনি। পত্র পত্রিকা কিছু ছিলনা।

ফুলিয়ায় একটা লাইব্রেরী ছিল। শিশির সিন্হা বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। তিনি সাহিত্য নিয়েও চর্চা করতেন।

নাটক করেছি আমি অনেক। একটি নাটকের কথা বলি। তারাসংকরের “কালো মাটির কান্না” নাটক হবে। মিঃ ধর বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। মিঃ ধর ডাক্তার হয়েছেন। তখন তো কোন মহিলা মেয়ের পার্টি করতেন না। ছেলেরাই মেয়ের পার্টি করবে। মাষ্টারমশাইরা অবশ্য খুব একটা চাইতেন না ছেলেরা নাটক করুক।

যা হোক নাটকের একটি দৃশ্য আছে কোলিয়ারিতে কলেরার সংক্রামক হয়েছে ডাক্তার আনা হয়েছে। ডাক্তার রোগী দেখছেন। বাইরে থেকে ছেলেরা চীৎকার করছে কানে নলটা লাগান, কানে নলটা লাগান। কানে লাগায়নি কিন্তু রোগী দেখে যাচ্ছেন।—আমি দাঁড়িয়ে আছি। আন্দোলন করছি সে রকম নায়ক আমি। কোলিয়ারির যিনি ম্যানেজার তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কিন্তু ম্যানেজার তা চান না এরকম একটা অবস্থা। ডাক্তার ঔষধ দিয়েছেন রোগীর মুখে। পাউডার দিয়েছেন। ডাক্তার তো দিয়েছেন কিন্তু রোগী আর গিলছে না। ডাক্তার বলছেন খেয়ে নাও খেয়ে নাও, রোগী আর খাচ্ছে না।

যা হোক ড্রপ সিন পড়ে গেছে। ডাক্তার হয়েছিলেন মিঃ ধর ইলেকট্রিকের সুপারভাইজার। তিনি তো অসম্ভব চটে গেছেন। কী ব্যাপার তুমি ঔষধ গিললে না কেন? আসলে হয়েছে কী দৃশ্য শেষে এমন ছিল যে কোলিয়ারিটা burst হয়ে যাবে—এক কোণে পটাশ আর গন্ধক রাখা ছিল ডাক্তার ভুল করে ঔষধ মনে করে ঐ পুরিয়ারিটাই মুখে দিয়েছেন। ও খাবে কেন। এরকম

শিক্ষার ক্ষেত্রে ফুলিয়ার অচল মস্তুরতা

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ বন্দনায় একশত বছর আগে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছিলেন তা একবার মানসপটে তুলে ধরুন। ‘সুজলাং সুফলাং শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম সুমধুর ভাষিনীম্।’ নদীয়া জেলার ক্ষেত্রে সবগুলি বিশেষণ একসময় অদ্বুতভাবে সত্য ছিল। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত শিক্ষার পূর্বাঞ্চলীয় তৎকালীন পীঠস্থান নবদ্বীপ ও শাস্তিপুর। শাস্তিপুরের গা ঘেসে ভাগীরথীর উভয় তীরে তখন সম্ভব ও প্রাণবন্ত গ্রামের পর গ্রাম। তারই মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রাম ফুলিয়া। শ্রীচৈতন্যের চিত্ত মাতানো প্রভাবে ও কৃষ্ণিবাসের অমর কাব্যে ফুলিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ধন্য। ইংরেজের আগমন ও শাসননীতি স্ব-নির্ভর ও স্বশাসিত গ্রাম বিকাশের সব পথ অবরুদ্ধ করে দেয়। নব্যশিক্ষিত ও সঙ্কল মানুষ নতুন রাজধানী ও নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার দিকে ধাবমান হন। সময় বুঝে ম্যালেরিয়া ও লাওঠা মহামারীর আকারে আক্রমণ করে বহু লোককে গ্রামছাড়া করে। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দীপ্তি ক্রমশ ম্লান হল। নিপ্রাণতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বিরল লোকবসতি। পরিত্যক্ত ও ভগ্ন গৃহ। বিমর্ষ বৃক্ষলতা ও অবিহ্বলত রোপঝাড়। অবহেলিত পথঘাট ঝিলপুকুর। কিছু দিনের মধ্যে গোটা অঞ্চল ঘেন ওন্দাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চারিদিক নিপ্রভ ও নিস্তব্ধ—যেন মৃতপ্রায় অঞ্চল।

সেই তন্দ্রা ভাঙ্গল ১৯৪৭ ও ’৪৮ সালের প্রচণ্ড বঁাকুনিতে। প্রাণস্পন্দন দেখা দিল ১৯৫০ ও ’৫১ সালে নবাগত লোকের পদচর্যায়। ওপার বাংলার ভীত ও আতঙ্কিত মানুষ কেউ সরকারী ক্যাম্পে গিয়ে উঠল, কেউ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে সেদিকে বসে যেতে লাগল। প্রাপ্ত স্বাধীনতা একদিকে দেশকে যেমন করল খণ্ডিত, আর একদিকে পরিত্যক্ত মৌন গ্রাম ও প্রান্তরকে করে তুলল মুখর।

পুনর্বাসনের চিন্তায় তখন ভারত সরকার উদ্বিগ্ন। পৌরাণিক কুরুক্ষেত্রের বিরাট প্রাস্তরে পুনর্বাসনের বলিষ্ঠ ‘কুরুক্ষেত্র স্কীম’ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। খ্রীঃস, কে দেব নেতৃত্বে। সমচিন্তা ও একই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয় নদীয়া স্কীম। দ্রুত রূপায়ণের দায়িত্ব হস্ত হ'ল এখানেও খ্রীঃদে মহাশয়েরই স্বন্ধে। সুপরিকল্পিত পুনর্বাসনের স্থান নির্বাচিত হ'ল বুঁইচার বিস্তৃত প্রাস্তর। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই ; শুধু বাজতে জোর চাই, মনে চাই ঐকান্তিক ইচ্ছা, চিন্তে চাই গভীর ঐশ্বরিক প্রেরণা। অদক্ষ পেশীকে সুদক্ষ পেশীতে পরিণত করা যায়, যদি থাকে তীব্র আকুতি। প্রতিকূল পরিবেশের মোড় ঘুরিয়ে অনুকূল পরিবেশে পরিণত করা যায় যদি থাকে জগন্ত বিশ্বাস। মস্তুরতার মধ্যে অসুন্দরের মধ্যে গতি ও সৌন্দর্য আনা যায় যদি থাকে কর্মে নিষ্ঠা। অনুন্নত গ্রামকে উন্নত করা যায় যদি থাকে সমবেত প্রয়াস ও সাধনা। সকলে খাটবে, হাতে হাত মিলিয়ে খাটবে, পেটভরে খাবার মত কসল উৎপাদন করবে, উৎপাদনের উপযোগী দক্ষতা বাড়াবে এবং নতুন জীবন, জীবিকা ও সমাজ গড়ে তুলবে—এই স্বপ্ন নিয়ে কাঁপিয়ে পড়া হলো বুঁইচার পরিত্যক্ত প্রাস্তরে যা আজ ফুলিয়া উপনগরী ও ফুলিয়া কলোনী নামে পরিচিত। ফুলিয়া বয়রা, মালিপোতা, বেলগড়িয়া কদমপুর ঘোড়ালিয়া, নবলা, পরেশনাথপুর, তুর্গাপুর উমাপুর, ঢাকুরিয়া, তেজপুর নিধকুঁড় বোয়ালিয়া ইত্যাদি প্রায় ১০০টি গ্রামের কর্মকাণ্ডকে সংহত ও পরিচালিত করবে শাস্তিপুর ও রাণাঘাটের মাঝখানে নবনির্মিত ফুলিয়া উপনগরী। সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় একান্ত আবশ্যকীয় জিনিসের উৎপাদনে ও বিনিময়ে এই অঞ্চল হয়ে উঠবে স্ব-নির্ভর। দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষুদ্র পারত পক্ষে বাইরের উপরে নির্ভরশীল থাকবে না। ফুলিয়া উপনগরীসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি পঞ্চায়েত দ্বারা স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্ররূপে দাঁড়িয়ে উঠবে। ভারত সাধারণতন্ত্রের প্রকৃত মজবুত ভিত গড়ে তুলবে ছিন্নমূল মানুষের সমবেত সাধনা ; এ-অঞ্চলটি হবে ভারতবর্ষের কাছে একটি মডেল। এই ছিল কল্পনা, এই ছিল স্বপ্ন।

এই বৈপ্লবিক স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রথম দরকার উপযুক্ত শিক্ষা প্রবর্তন। শিক্ষা মানুষ তৈরী করে। কাজেই উদ্দেশ্য বিহীন মামুলি শিক্ষা নয়, গান্ধীজী কল্পিত 'নব জালিমে'র প্রবর্তন করে সূর্য থেকেই দেহে মনে ও বুদ্ধিতে শক্ত মানুষ গড়ে তোলা হবে। স্বজনশীল কাজ, খেলা ও লিখাপড়া'র সুন্দর সংযোজন আর মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের ছোট থেকে ভাষার বাঁধুনি মজবুত করা হবে এবং কল্পনা শক্তির বিকাশ করা হবে। শুকনো প্রাণহীন কতকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়; বৃক্ষলতায় সুশোভিত আনন্দ-মুখর বুনিয়াদী বিদ্যালয়। আজ ফুলিয়া উপনগরীতে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে—তার মধ্যে ৩টি সরকার স্বীকৃত এবং ১টি অমুমোদন এখনও পায়নি। একটিও স্ট্যান্ডার্ড বিদ্যালয় নয়; কোথাও আশালুরূপ লিখাপড়া হয় না; সবই মামুলি। ছেলেমেয়েদের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিবার পরিবর্তে অনেকটা পন্থা করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ তৈরীর প্রাথমিক কাজ দারুনভাবে ব্যাহত হয়। কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, মাধ্যমিক স্তরেও অধোগতি অত্যন্ত স্পষ্ট। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২/৩টি ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউই সাবলিল ভাবে মনের ভাব মাতৃভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না—কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কি সমাজ বিজ্ঞানে অথবা সাহিত্যে। ইংরেজী ভাষার কথা উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয়। ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন ও বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তৃতীয় বিভাগে পাশ করছে, অথবা কম্পার্টমেন্টাল পাচ্ছে। সাধারণ উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার পথ এদের অবরুদ্ধ হচ্ছে।

কি প্রচণ্ড অবক্ষয়! দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এই বিনষ্টির দ্রষ্টা আমাদের কোন আত্মশ্লানি নেই। উভয় বিদ্যালয় সংলগ্ন জমি ঘিরে নিতে পারলে বিদ্যালয়ের পরিবেশই আলাদা হয়ে যায়। বহিরাগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কোন কোয়ার্টার নেই। ছাত্রদের একটি হোস্টেল নেই। ওয়ার্কএডুকেশন চালু করা হয়েছে অথচ কোন ওয়ার্কশেডের ব্যবস্থা নেই।

ফুলিয়া উপনগরীতেই এখন সাড়ে আটহাজার লোক বাস

করছে। সাড়ে পাঁচ হাজার লোক বাসের উপযোগী করে শহরটি গড়া হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪০/৪৫ হাজার লোক বাস করছে। আর একটি করে মাধ্যমিক স্কুল ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। অথচ সাড়ে পাঁচশত ছাত্রছাত্রীর একটি জুনিয়ার হাই স্কুল সরকারী স্বীকৃতি পাচ্ছে না। সরকারী পতিত জমি থাকা সত্ত্বেও নতুন স্কুলের জন্য উপযুক্ত জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। কুস্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়, ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন ও ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয় এই তিনটিই মাধ্যমিক শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠান। ফুলিয়া অপেক্ষা অনেক পশ্চাদপদ গ্রামে কলেজ চলছে। ফুলিয়ার ছেলেমেয়েদের চাকদহ, কল্যাণী ও নৈহাটী গিয়ে কলেজে পড়তে হচ্ছে।

কৃষ্ণনগর ছাড়া এ অঞ্চলে কোন পলিটেকনিক্ ইনস্টিটিউট নেই। আশ্চর্যের বিষয় ফুলিয়া উপনগরীতে ১৯৫১ সালে যে পলিটেকনিক্ নির্মিত হয়েছিল তার কোন উন্নতি সাধনের চেষ্টা বিগত ৩০ বছরে করা তো হয়ইনি, বরং অবনতি ঘটেছে সর্বস্তরে। উপর মহলের সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষামন্ত্রী পল্লীর এ-সব ছোটখাটো বিষয়ে তাকাবার ও চিন্তা করবার সময় পান না। প্রযুক্তি বিদ্যার উপরে, কারিগরী কাজের উপরে সারা বিশ্ব যেখানে প্রচণ্ড জোর দিচ্ছে, ভারতবর্ষেও যখন টেকনিক্যাল এডুকেশন সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে সেখানে ফুলিয়া পলিটেকনিকের এ হাল কেন? যেখানে একদিন স্বপ্ন দেখা হয়েছিল স্থানীয় ছেলেমেয়েরা এই পলিটেকনিকের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ নিয়ে এ-অঞ্চলে বহুবিধ নির্মাণ কাজে অংশ নিবে। বাইরে থেকে কারিগর আনবার দরকারই থাকবে না; শুধু তাই নয়, এখানকার ট্রেড তরুণ তরুণী দেশের বিভিন্ন এলাকার কর্মকাণ্ডে অংশ নিবে। কোথায় গেল সে স্বপ্ন! বিগত কয়েক বছরে কর্মক্ষম ছেলেমেয়ের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে আর কার্যকরী শিক্ষার ক্ষেত্রে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে। ফুলিয়ার জনমত আজও এ-বিষয়ে সচেতন নয়। শিক্ষা বিভাগের এই তন্দ্রা, এই উদাসীনতা, এই অবহেলা পাপ, শুধু পাপ নয় বিশেষ সংখ্যা ফুলিয়া—৩৪

সহাপাণ। অমার্জনীয় অপরাধ। যেখানে বেকারের সংখ্যা
 যত বাড়বে, সেখানে সমাজ বিরোধী যুবকের সংখ্যা আনুপাতিক
 হারে বেড়ে উঠবে।

ফুলিয়ার গ্রামসেবক প্রশিক্ষন কেন্দ্রের দিকে তাকালে চোখে
 জল আসে, মনে প্রচণ্ড স্কোভ জন্মে। যেখানকার স্টাফ এবং
 প্রশিক্ষন প্রাপ্ত তরুণ তরুণী গ্রামে গ্রামে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে
 উৎসাহ দিবেন, পরামর্শ দিবেন, হাতে ধরে শিখিয়ে দিবেন—সেই
 প্রশিক্ষন কেন্দ্রে এত কর্ম বিমুখতা, এত উদাসীনতা, এত
 অবহেলা, এত ফাঁকি !! এমন প্রাণহীন ট্রেনিং সেন্টারে যে সব
 যুবক ট্রেনিং নিতে আসবে তারা নিঃসন্দেহে কর্ম বিমুখ হয়ে ফিরে
 যাবে, স্তিমিত উচ্চম নিয়ে সরকারী কাজে প্রবেশ করবে। কৃষি
 প্রযুক্তি বিচার ট্রেনিং-স্টাফের অধিকাংশ ডেলি প্যাসেঞ্জার।
 ২৬।২৭ একরের ফার্ম এখন উষর ভূমি ; সেচব্যবস্থা থেকেও অচল।
 ৫।৬ জন কৃষিবিদসহ জনা পনের শিক্ষক ও বহু স্টাফ দিনগত
 পাপক্ষয় করছেন। সরকারী ব্যয়ে কর্মক্ষম মানুষকে অকর্মণ্য
 মানুষে পরিণত করা, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিষ্ঠাহীন করে তোলা
 উচ্ছোমী যুবককে নিরুচ্ছোমী বানানোর পরিপূর্ণ বাতাবরণ গ্রাম
 সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সর্বস্তরে। কৃষিমন্ত্রী, সেক্রেটারী, ডাইরেক্টর
 কারো দৃষ্টি নেই ট্রেনিং সেন্টারের কাজকর্মে। কৃষিবিভাগের দেহে
 আজ কানসার। এটা তারই লক্ষণ। দৈহিক কাজে য আমরা
 পরানুখ তার ছাপ সর্বঅঙ্গে।

হস্তচালিত তাঁতশিল্প এখন ফুলিয়ার গর্বের খন। কিন্তু
 প্রতিযোগিতার বাজারে সীমিত দক্ষতা বিপদের আশংকায় ভরা।
 তরুণ তন্তুবায়দের দক্ষতা যাতে নিয়মিত বাড়ান যায় তার কোন
 প্রশিক্ষন কেন্দ্র ফুলিয়ায় এখনও গড়ে উঠেনি। অথচ এর
 প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। শিল্পীর মানুষের রুচি প্রভাবিত
 করার শক্তি রাখে, কাজেই ডিজাইন বিষয়ে ট্রেনিং প্রয়োজন।
 মার্কেট স্টাডি, বিজিনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পৃথক প্রশিক্ষণের
 আয়োজন চাই। দক্ষ হাতকে আরো সুদক্ষ করে তোলার জন্য
 সাহিত্য সৈকত

ফুলিয়ার তত্ত্ববায় সম্প্রদায়দের সচেতন ও সক্রিয় হওয়ার সময় এসে গেছে।

গোটা ভারতে অস্থির চরখা বহু অসহায় নারী পুরুষকে অন্ততঃ বেঁচে থাকার মত কাজ দিচ্ছে। অস্থির চরখার ট্রেনিং ফুলিয়া থেকে কেন তোলা হয় তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ফুলিয়া উপনগরী থেকে কোন প্রতিবাদ উঠেনি সে সময়। আজ এর প্রয়োজনীয়তা অনেকে উপলব্ধি করছে। খাদি কমিশনে পুনরায় বলবার কথা চিন্তা করছে ফুলিয়াবাসী! অথচ বেকার নারী পুরুষে চারিদিক ছেয়ে গেল।

শিক্ষা ব্যৱস্থাকে দুর্বল রেখে সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন বাতুলতা। আবার শিক্ষা মানে পুঁথি মুখস্থ করার শিক্ষা নয়। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে গায়ে গতরে খেটে, হাতে কলমে করে উৎসাহিত সত্যকে ভাষায় ব্যক্ত করার শিক্ষা আমাদের চাই। তবেই স্ব-নির্ভর শোষণমুক্ত সমাজ আমরা গড়ার পথে এগোতে পারব। এই স্বপ্ন নিয়েই ফুলিয়া কলোনীর সূত্রপাত। আজ আমাদের সকলের আত্ম-সমীক্ষা প্রয়োজন। ৩০ বছর পরে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছি—জয় যাত্রার দিকে, না পরাজয়ের দিকে?

ফুল্ল কথা হ'চ্ছে এটা কার (বাবী)

সমরতোষ বজ্যাপাধ্যায়

[পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে]

আমি ফুলিয়াতে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যাই। ২ বছর ৯ মাস ছিলাম। ফুলিয়াটাকে ব্রহ্মডান্ডার (১) ঘাঁঠ বলতো। বুন্দো জমির লোকেরা স্বনির্ভর হবেন, কাজ কারবার গড়ে ওঠবে—ধারণা ছিল ফুলিয়াকে মক্কান করে তোলা হবে।

ফুলিয়াটা গড়ে ওঠেছিল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ আদর্শ নিয়ে কিন্তু অত্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে। পরবর্তী সময়ে কী ঘটবে তার খুব একটা সম্যক চিন্তা ছিলনা।

আমি যাবার পরে ভারত সরকার টাউনশিপের management হস্তান্তর করেন। হস্তান্তর ছ'রকমের হতে পারে—Transfer of ownership এবং Transfer of Administration বা management. ত্রীযুক্ত প্রতিভু গুঠাকুরতার কাছ থেকে আমি কার্যভার গ্রহণ করি।

পঃ বঃ সরকার তাদের সাধ্যানুসারে একটা Pilot project of community Development গড়ে তুলেন এবং ফুলিয়াকে হেড কোয়ার্টার্স করেন। পাকারাস্তা, নলকূপ, কয়েকটি সরকারী অফিস তৈরী হয়। ঠাণ্ডীদের পুনর্বাসন, ট্রেনিংসেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ পঃ বঃ সরকারের সাহায্যে হয়। রাজ্য সরকারের যত রকমের স্কীম আছে তার প্রায় সব কটাই ফুলিয়াতে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি ২৭ বছর ফুলিয়া ছেড়ে এসেছি। হালফিল অবস্থা কী জানিনা। ফুলিয়াটা যে খুব একটা পেছিয়ে পড়ে আছে তা' মনে হয় না। ফুলিয়ার শাড়ী খুব নাম করেছে। Expectation এবং achievement এর মধ্যে তফাৎটা যদি বেশী হয় তা হলেই একটা হতাশা দেখা দেয়—ফুলিয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

জমির ওপর যদি নিজের মালিকানা না বর্তায় তা হলে তার প্রতি মমত্ব বোধও গড়ে ওঠে না। সেটা হলে, অল্প রকম হতো। ভারত সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন, টাউনশিপ তৈরী করেছিলেন তারপর তা হস্তান্তর করে দেন। কিন্তু যে পরিকল্পনা নিয়ে এটা সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে পঃ বঃ সরকার কতটুকু সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা ভেবে দেখতে হবে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যার ওপর অধিকার নেই সেটা তত্ত্বাবধান করা, দেখাশুনা করা বা উন্নতি করার পেছনে বাধা বিঘ্ন থাকে। সামান্য ছোটখাট ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হয়। এর কলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না।

এখানে উদ্বাস্তুদের বাড়ী দেয়া হয়েছে অসুস্থ amenities দেয়া হয়েছে তাই অসুস্থ উদ্বাস্তুদের মত বছর বছর এদের টাকা দেয়া হয়নি। বড় রকমের Industry করার জন্তে তার Economy কে Booster করার জন্তে সে রকম কোন চিন্তা করা হয়নি।

মূল কথা হচ্ছে এটা কার বেবী ভারত সরকারের না পঃ বঃ সরকারের। যদি একক দায়িত্ব কারো থাকে তাহলে ভালভাবে নজর দিতে পারে। আমার মনে হয় এখানেই মূল সমস্যাটা রয়েছে।

উদ্বাস্তুরা যে যেখানে আছেন তারা তো তাদের জমির মালিকানা দাবী করতেই পারেন। লিঙ্গটা ৯৯ বছর না ১১৯ বছর হবে তা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। তবে অসুস্থ জায়গায় যে সমস্ত উদ্বাস্তু রয়েছেন তারা যদি ১১৯ বছর পান তবে ফুলিয়ার উদ্বাস্তুরাই বা পাবেন না কেন।

এখন আর কাউকে উদ্বাস্তু বলা আমি ঠিক মনে করিনা। তারা এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে এখন পূর্ণ নাগরিক। কোনো কথটা বর্জন করলেই ভাল হয় সেই বোধটাও হওয়া উচিত—আমরা এখানকার নাগরিক, এখানকার বাসিন্দা।

জব্বানসের সৃষ্টি সামগ্র্যে আমি প্রচণ্ড আস্থাশীল

সন্তোষ কুমার ধর

(পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার)

প্রঃ কৃষ্টিবাসের পর থেকে ফুলিয়ার জনমানসের ওপর দিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে বিবর্তন ঘটে গেছে সে ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনি কিছু বলুন না !

উঃ কৃষ্টিবাসের কাল থেকে বর্তমান সময় অবধি দীর্ঘ পাঁচশ বছরে এই অঞ্চলে তেমন যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। তবে এ ব্যাপারে শাস্তিপুরকে বাদ দিয়েই ভাবতে হবে। শাস্তিপুর বহু সাংস্কৃতিক ভাবধারার পীঠস্থান। ফুলিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্লাবিত ধন কৃষ্টিবাস। তাঁর রামায়ণ এক সময়ে বাঙালীর জনমানসে ভাবের প্লাবন এনেছিল। তাঁর রামায়ণের ছত্রে ছত্রে বাঙালী নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে তেমনটি কী আর আছে ?

দেশীয় জমিদার বা রাজারা বহুবিধ জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। তেমন কোন জনহিতকর কাজের ছাপ এই অঞ্চলে আছে বলে মনে হয়না। পক্ষান্তরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারী হাত এই অঞ্চলেও প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে। এই দীর্ঘ সময়ে ফুলিয়া কিছুটা বন্ধাও অবস্থায় ছিল। ১৯৫০ সাল থেকেই পূর্ববাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল শরণার্থীদের পুনর্বাসন মানসে এখানে কর্মঘট্ট আরম্ভ হয় এবং তা অনেক ঘাত প্রতিঘাতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এগোতে থাকে।

প্রঃ ১৯৫০-৫২ সালে ফুলিয়া উপনগরী গড়ে ওঠে। এখনও এই উপনগরীর মধ্যে বহু অব্যবহৃত জমি পড়ে রয়েছে। এই কঁাকা

জমিতে কোথাও কোথাও বেনামী লোকের বাসস্থান গড়ে উঠছে। এই সমস্যা নিয়ে আপনার ভাবনা-চিন্তা কী?

উ: ফুলিয়া উপনগরীর অব্যক্তি জমির সমস্যা দীর্ঘদিনের। যারা এই বর্টন ব্যবস্থায় যুক্ত আছেন তাঁদের ত্রায় নীতির ভিত্তিতে এই ব্যাপারে আরো সক্রিয় হতে হবে। তবে এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে ফুলিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কোন বা না লাগে। কারণ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জমির একটা ভূমিকা আছে এ প্রসঙ্গে ব্যক্তি জমির মালিকানার প্রসঙ্গটাও এসে যায়। অনেকেই বর্তমানে এই সমস্যায় ভুগছেন। এরও একটা সুরাহা করতে হলে চাই সকলের সুসংহত প্রচেষ্টা।

প্র: ফুলিয়া সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টারটি বর্তমানে ভো বন্ধের মুখে। একে কীভাবে বাঁচিয়ে তোলা যায় বলে আপনার মনে হয়?

উ: ফুলিয়া সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার বর্তমানে নিজেই অপুষ্টিতে ভুগছে। এই রোগ নিরাময় কেন্দ্র নিজেই রোগগ্রস্থ। ডাক্তার থাকে তো ঔষধ থাকেনা ঔষধ থাকে তো ডাক্তার থাকেনা। অথচ এক বিরাট জনসমষ্টি এর উপর নির্ভরশীল। বছ বছর ধরে এটা কয়েকটা শয্যা বিশিষ্ট ছিল বর্তমানে তাও নেই। প্রসূতি মায়াদের চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই, সাপে কাটা রোগীদের চলে যেতে হয় শাস্তিপুর গ্রামীণ হাসপাতাল বা রাণাঘাট মহকুমা হাসপাতালে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে একে মুক্ত করতে হলে চাই সমবেত এবং সংহত প্রচেষ্টা যার কাছে যে কোন প্রশাসনকে নতি স্বীকার করতে হয়। ফুলিয়া একটা declared township এই S.H.C. কে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করাটা খুবই দুর্লভ ব্যাপার নয়। এর অধীনে প্রচুর জমি আছে। একে একটা মোটামুটি আধুনিক হাসপাতাল হিসাবে পেতে হলে ফুলিয়া, নবলা ও বেলগড়িয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের লোকদের সংগঠিত করে

এই দাবীতে সোচ্চার করে তুলতে হবে। কেননা, এই বিরাট অঞ্চলের জন স্বাস্থ্যের প্রতি কোন সরকারই উদাসীন থাকতে পারে না।

প্রঃ ফুলিয়া পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউশনের অবস্থাওতো প্রায় হাসপাতালেরই মত। —এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

উঃ ফুলিয়া পলিটেকনিকেরও মুমূর্ষু অবস্থা। এখান থেকে যে certificate নিয়ে ছাত্রেরা বের হয় এককালে এর কিছুটা কদর থাকলেও বর্তমানে বোধহয় এটা উপেক্ষিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে অধ্যয়নরত ছাত্রেরা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে একে upgraded করতেই হবে কৃষ্ণনগরের পালচৌধুরী পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটের সমপর্ষায়। তবে তো কিছুটা আশায় বুক বেঁধে এখান থেকে সফল হয়ে বেরিয়ে আসা ছেলেরা জীবন যুদ্ধে প্রতিযোগিতায় সামিল হতে পারবে। যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই upgradation প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবেন।

প্রঃ এখন তো সরকারের অনেক কাজের দায় দায়িত্বই পঞ্চায়েতের উপর। এ অঞ্চলের পঞ্চায়েতের কাজের ভাল-মন্দ কী রকম কী দেখছেন?

উঃ বেশ স্পর্শ কাতর প্রশ্ন। প্রচণ্ড controversial ও বটে। পত্র পত্রিকায় এ ব্যাপারে হামেশাই কিছু না কিছু বেরুচ্ছে এবং তা অনেক সময়ই ক্রটি মধুর হয় না। তবে আমার যা ধারণা কিছুটা উদারতা, সততা এবং ঐকান্তিকতা নিয়ে এগুলো পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বহুবিধ জনহিতকর কাজ করা যায়। তবে যেন কিছুটা রাস্তায় মাটি কেলা বা ভরাট পুকুরের পঙ্কোদ্ধার পর্যায়েই শুধু সীমিত না থাকে। আমি কিন্তু তা খুব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। কাজটা যেন আরোও এগিয়ে যায় কাজটা যেন ফলপ্রসূ হয় কেননা,

এ ধরনের কাজ অনতি বিলম্বেই পূর্বাভাসায় ফিরে আসে।
 রাস্তায় মাটি ফেললাম বৃষ্টিতে ধুয়ে চলে গেলো, পুকুরের
 মাটি কাটলাম ছ'দিন বাদেই ভরাট হয়ে গেলো এসব
 কাজের কোন permanent effect জন সমষ্টির ওপর
 হয়না। দেখতে হবে দীর্ঘ দিন ফল ভোগ করা যায় এমন
 কাজ যাতে সম্পন্ন করা যায়।

প্রঃ ফুলিয়া টাউনশিপ হওয়ার আগে একটা বেলগাছ তলায়
 প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল তারপর থেকে তো অনেক
 বছর কেটে গেছে অনেক পরিবর্তন হয়েছে একজন শিক্ষাব্রতী
 হিসাবে এখানকার শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে আপনার ধারণার
 কথা বলুন না।

উঃ ভারতীয় শিক্ষা প্রথমে আশ্রমেই শুরু হয়েছিল—আশ্রমিক
 পরিবেশ—যে প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ, আমরা
 যাকে ধ্যায় বলে মনে করি, শাস্তিনিকেতনের ছায়া—অনিবিড়
 পরিবেশে শিক্ষাক্রম গড়ে তুলেন, হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনে
 অমুকুল। আমাদের আরম্ভটাও কিন্তু শুভ। শুভটাকে
 আরও কতটা শুভর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি তাই
 চিন্তা। হয়তো হয়েছে। প্রাসাদ হয়েছে, ছেলেদের স্কুল
 মেয়েদের স্কুল হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আরও
 হওয়ার scope রয়েছে।

শিক্ষার পুণর্মূল্যায়নের ভাবনা একটা জাতীয় পর্যায়ে
 ভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা,
 স্বাদেশিকতাকে লালন করে। কৃষ্টিবাসের স্মৃতি বিজরিত
 এই ফুলিয়া। কৃষ্টিবাস ভারতীয়তার মূর্ত প্রতীক। ফুলিয়া
 বাসীরা এই অঞ্চলে তারই নামাঙ্কিত একটি মহাবিদ্যালয়
 স্থাপনে ব্রতী হতে পারেন। সংকল্প যদি সাধু হয় there
 shall be no Alps.

ফুলিয়ায় Vocational Training Institute স্থাপনের
 সুযোগ আছে বলে মনে হয়। যদি তা, করা যায় তা হলে
 চাকরীর সুযোগ, Self employment এর সুযোগ হতে

পারে যাতে করে one can employ oneself without seeking anybody's grace.

প্রঃ এখানকার শিশুশিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উঃ আমি মনে করি ফুলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষাটা অবহেলিত। প্রাথমিক শিক্ষাটা খুব একটা গুরুত্ব পাচ্ছেনা। প্রাথমিক শিক্ষাটা যদি সুস্থ না হয় তা হলে প্রচণ্ড একটা Vacuum থেকে যায়। এটার জন্য যারা অনন্ত সতর্ক নাগরিক রয়েছেন তাঁদের একটু অগ্রণী হওয়া উচিত। —এ প্রসঙ্গে আমি ইংরেজী তুলে দেয়ার সরকারী শিক্ষানীতির কথা তুলছি না —তবে ফুলিয়াতে যদি নার্সারী জাতীয় কোন স্কুল হয় তা হলে অন্ততঃ better education than that we have at Phulia — হবেই।

প্রঃ ফুলিয়ার যুব সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চেতনার কোনো দিক কী আপনার মনে দাগ কেটেছে?

সাংস্কৃতিক চেতনা জীবন চেতনারই নামান্তর। সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় এক মহত্তর সংকল্পের দিকে যা হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে শান্তির অমিয় ধারায় সিক্ত করে তুলতে পারে। যুব সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চেতনা এমনি ধারাতে প্রবহমান হওয়া উচিত বলে মনে করি। তবে young generation often becomes angry generation, ফুলিয়ার সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন গোষ্ঠী নিশ্চয়ই আছে। তবে তাদের অপসংস্কৃতির আক্রমণ বোধে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের সংস্কৃতি সাধনায় there is scope for betterment.

প্রঃ ফুলিয়ার সামগ্রিক উন্নতি ভাবনায় ফুলিয়ার অধিবাসীদের সুস্থ গণমুখী চিন্তা-চেতনা কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উঃ সব সময় সর্বত্র আরো উন্নতির সুযোগ থাকে। There should not be any scope for self comp-

lacence. আত্মতৃপ্তির ভাব কিন্তু মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বাহত করে। তাই ফুলিয়ার সামগ্রিক উন্নয়নে ফুলিয়া বাসীকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

ফুলিয়ার বহু অব্যবহৃত জমি আছে যা ফুলিয়াতে শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। ফুলিয়াকে প্রাণ চঞ্চল করে তোলার মানসে ফুলিয়া, নবলা ও বেলগড়িয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতকে নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি Notified area গড়ে তোলা যেতে পারে যা কালে Municipality তে রূপান্তরিত করা যায়।

প্রথমে শুনলে হয়তো মনে হবে এ বড় ambitious scheme হয়তো utopian ও বটে কিন্তু মনে রাখতে হবে Rome was not built in a day.

এ অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নকে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ আছে বলে। মনে হয় না। এটাও আমার একটা প্রাসঙ্গিক ভাবনা। এই ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। কারণ আইন শৃঙ্খলার অবনতি শান্তি তথা উন্নয়নের প্রচণ্ডতম পরিপন্থী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফুলিয়ায় একটি Police outpost স্থাপন করার দাবীতে সকলকেই সোচ্চার হতে হবে

ফুলিয়ার সামগ্রিক উন্নয়নে এই অঞ্চলের কুটীর শিল্পের উন্নয়নের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে। কুটীর শিল্প অর্থনীতির শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তুলতে বেশ সহায়ক। ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের বর্তমানে ভাব তছোড়া এর নাম আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিতে হবে। পূর্ববাংলার ঢাকা-টাঙ্গাইলের বহু নামী তাঁতশিল্পীর বাসস্থান ফুলিয়া। প্রয়োজনীয় সরকারী এবং বেসরকারী আলোকুলা পেলে এই সার্থক ব্যয়ন শিল্পীরাই ঢাকার মসলিনের হুতগোরব এই ফুলিয়ার বুকেই পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

সৃষ্টি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জন মানসের সৃষ্টি সামর্থ্য আমি প্রচণ্ড আস্থাশীল। এক বিরাট আশার আলোয় বুক বেঁধে আছি—যা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সৃষ্টি স্রুতের উজ্জ্বল উজ্জলিত করে তুলবে। কবি গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারবো—

“ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।”

ফুলিয়া উপনগরী পরিকল্পনা

দেবপ্রসূন ঘটক

সাল ১৯৬১-৬২। সরকারী কাজের সূত্রে ফুলিয়া উপনগরীর সাথে আমার পরিচয়। যদিও অনেক সময় পার হয়ে গেছে “তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল।”

শিক্ষা বিভাগের সমাজ শিক্ষা দপ্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি আমি। সেজন্য ফুলিয়ার তৎকালীন সংস্কৃতি ধারার সাথে আমার নৈকট্য খুব সহজেই গড়ে উঠেছিল। গ্রাম বুইচা—রামায়ণকার মণিকবি কৃষ্ণিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া বয়সের সন্নিকট। জাতীয় সরকার স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে বুইচাকে ফুলিয়া নামে অভিহিত করেছেন আদি কবির প্রতি জাতীয় ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ।

স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মন্ত্রীসভার রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএস, কে, দে পরিকল্পনা কমিশনের বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী গ্রাম বুইচাকে বেছে নিয়েছিলেন গ্রামীণ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করতে। কালের রূপোলভলে শুভ্র সমুদ্রজল ফুলিয়া উপনগরীর এই ভাবেই পল্লব। পাক্সাব প্রদেশের নিলোখেড়ি এবং পশ্চিমবাংলার ফুলিয়া উপনগরী নূতন ভারতবর্ষ গড়বার কারখানা রূপে হল চিহ্নিত।

নানা জ্ঞানীশীলী, সমাজসেবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজপুরুষের পদধূলি যথ্য এই ফুলিয়া উপনগরী। নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খোলবার জন্ত শুরু হল বাজা-নির্ভীক পদক্ষেপে। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের (Community Development Project) কর্তৃপক্ষরূপে এসেছিলেন সুশীল দে আই, সি, এস, হিরায় বানার্জী, আই, সি, এস, সমরতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, এ, এস, প্রমুখ স্বনামধন্য পুরুষেরা।

দেশবিভাগের দগদগে আঘাত তখন সত্ত্ব কতিত পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনকে একেবারে পুর্নদস্ত করে তুলেছিল। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তর দল প্রাণ

মানের ভয়ে সাতপুুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশ থেকে আছড়ে এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপত্যকায়। এদের পুনর্বাসন সমস্যা স্বভাবতই ভাবিয়ে তুলেছিল জাতীয় সরকারকে। ফুলিয়া উপনগরী দিশেহারা ছিন্নমূল আশ্রয়স্থল হয়ে প্রসারিত করল তার অনাবিল বদাগ্ধতা। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে ও পরিচালনায় “নতুন ইহুদীদের” আবাসন গৃহগুলি ক্রমে ক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করল। আশাহত মানুষগুলির হৃদয়ে ধ্বনিত হল “ঐ নতনের কেতন ওড়ে তোরা সব জয় ধ্বনি কর।”

জীবন ও জীবিকার সমস্যাই সংগ্রামী মানুষকে যুগে যুগে নতুন ভাবে পথ চলার সন্ধানে দেয়, আহ্বান জানায় “চরৈবেতি” মস্ত্রে। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সাথে সাথে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মোল চাহিদা মেটানব প্রয়াস নিরন্তর সর্বকালে সর্বযুগে। কারণ ‘Man can not live by bread alone’, “ফুলিয়া উপনগরীতে যারা বসবাস শুরু করলেন নতুন জীবনের সন্ধানে তাঁদের মনের পুষ্টি সাধনের সুযোগ করে দিতে তৈরী হল ঐতিহ্যবাহী জনরঞ্জন কেন্দ্র। সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কর্মী হিসাবে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার নিবিড় সান্নিধ্য। ফুলিয়াবাসীদের কৃষ্টি মূলক সমস্ত ক্রিয়াধারা জনরঞ্জন কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত। আমার কালে যারা এই প্রতিষ্ঠানটির পুরোধা ও অগ্রণী পুরুষ ছিলেন লিখতে গিয়ে তাদের কয়েকজনের ভূমিকা আজও আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আজ আর ইহলোকে নেই। কিন্তু ফুলিয়া উপনগরীর চিন্তা চেতনা ও কৃষ্টিমূলক কর্মে এঁদের দান অপরিসীম। যারা এসেছিলেন তাঁরা হলেন গনেশ রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, তদানীন্তন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মুছল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল চক্রবর্তী, বিদ্যা সমাদ্দার, শিশির সিনহা মোহন সরকার ও রাজেন্দ্রলাল ভৌমিক, কুলদা প্রসাদ মজুমদার এবং

নির্মল চ্যাটার্জী আরও অনেকে যাদের নাম ঠিক এই মূর্ত্ত আমায় মনে আসছে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুলিয়ার জনজীবনে একটি বলিষ্ঠ কৃষ্টিধারা প্রবহমান রাখতে নিরন্তর প্রয়াস ছিল এঁদের। ফুলিয়া সকল কাজের এঁরাই ছিলেন 'কাছী' এবং একাত্ম।

আর্থিক প্রতিকূলতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উদ্গম ও আন্তরিকতা থাকলে সব বাধা কাটিয়ে ওঠা যায় তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজ উল্লেখ্য “ফুলিয়া রঙ্গমঞ্চ” ফুলিয়া গ্রন্থাগার। রবীন্দ্র শত বার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রকানন। এরই পাশাপাশি পরিপূরক শক্তি হিসাবে “শিল্পী তীর্থ” “সব পেয়েছির আসর” প্রভৃতি ছোট ছোট সংগঠনগুলি অনেক সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে নিজেদের ড'লা সাজিয়ে। সংহতির মধ্যে গড়ে উঠেছে এক নিয়ত বহমান আনন্দের ধারা।

সরকারী প্রচেষ্টাতে তৈরী হয়েছে ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়, মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়। বৃত্তিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে Vocational Training Centre. গ্রাম সেবক সেবিকাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও টাঙ্গাইলের বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে। অখ্যাত বুঁইচা গ্রামের স্বদূর প্রসারিত অব্যবহৃত মাঠ মানুষের জীবন স্পন্দনে মুখরিত—পরশমণির হোয়ায় অহল্যার মুক্তি ঘোষিত। আজ ফুলিয়ার তন্তুজীবী সম্প্রদায় টাঙ্গাইল বস্ত্র শিল্পের অচুপম বিপুল সম্ভার নিয়ে স্বমহিমায় আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল এবং পশ্চিমবঙ্গের গৌরব। অদূরে আদিকবি কুস্তিবাসের জন্মস্থানে নির্মিত কুস্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা ফুলিয়া উপনগরীর পরোক্ষ দানে সমৃদ্ধ।

জোয়ার ভাঁটার টানাপোড়েনে জীবন এগিয়ে চলেছে। শ্রোত কখনও দ্রুত কখনও বা স্থিমিত। ফুলিয়া ফার্মের ফুলের বাগান যা চলার পথে পথিকদের খানিকটা আনমনা করে দিত আজ তার হতভী অৱস্থা মনকে ব্যাধাত্মক করে তোলে। অনুমান করি যে কৃষ্টিধারা একদা প্রাপবন্ত ছিল আজ তা কথঞ্চিৎ শ্রিয়মান।

মানুষকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার বিধাতা দিয়েছেন। আজকের ফুলিয়া উপনগরীর যৌবন—আমার বিশ্বাস এই সাময়িক ক্রান্তিকে অস্বীকার করে সংস্কৃতির বহমান ধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করতে এগিয়ে আসছে ও আসবে। ‘সৈকত’ পত্রিকার আবির্ভাব ফুলিয়া উপনগরীর মননশীল মানুষের অগ্রগতির পথে এক দৃঢ় হাতিয়ার। ফুলিয়া উপনগরীর তুর্গা পূজার মেলা যা আমার কালে ছিল স্মৃচনা মাত্র আজ নানা মানুষের ভিড়ে বাৎসরিক উৎসব এবং বিশেষ আকর্ষণ। বস্ত্র বিপণির ইউনিট ও কোন্ড ষ্টোরেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি ও নূতন জীবনের চোতক।

সকলের জ্ঞাতার্থে

ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী **সৈকত**

পত্রিকার নাম পরিবর্তন হয়ে

সাহিত্য সৈকত হয়েছে।

ফুলিয়া উপনগরী

মোহিত ভট্টাচার্য্য

ফুলিয়া বেশী দূরে নয়। শিয়ালদহ শাখায় শাস্তিপুর লাইনে ফুলিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এই অঞ্চল। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮৪ কিঃ মিঃ। ফুলিয়ার বড় পরিচিতি রামায়ণ রচয়িতা আদি কবি কবিত্ববাসের জন্ম এই ফুলিয়াতেই। ফুলিয়া নদীয়া জেলার আরও অনেক অঞ্চলের মত অবশ্যই একটি বিশিষ্ট অঞ্চল।

দেশ ভাগের ফলে অগণিত উদ্বাস্তু যখন ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে তখন এই ফুলিয়া এলাকা নির্বাচিত হয় এক আদর্শ উদ্বাস্তু উপনগরী গড়ার কাজে। পরিকল্পনা শুরু হয় পাঞ্জাবের নীল খেবির খাঁচে। এই উপনগরী হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এখানে থাকবে মানুষের প্রয়োজনের সব কিছু। এই ছিল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। ফুলিয়ায় এছাড়া জমি অধিগ্রহণ করা হলো প্রায় ২৫০০/২৬০০ বিঘা। শুরু হলো কর্মসম্মত। সব শ্রেণীর উদ্বাস্তু পরিবার এলো। কৃষক, শ্রমিক কারিগর, বুদ্ধিজীবী সবাই। এখানে থাকবে সকলের জীবিকার সংস্থান এবং ঐ সাথে সুখ সচ্ছন্দের অগ্রাগ্র উপকরণ। সরকারী ব্যবস্থা এবং উদ্বাস্তুদের সহযোগিতায় কাজ এগিয়ে চললো দ্রুত। গড়া হলো সবুজপল্লী কৃষিপল্লী। গড়া হলো কল কারখানা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘর বাড়ি, বাজার হাট, স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি। বাড়ি তৈরী হলো প্রায় ৮৫০-৯০০টি এই বাড়ি কিছু দেওয়া হলো উদ্বাস্তু পরিবারদের আর কিছু বাড়ি ও জমি নিয়ে হলো কৃষি খামার। কিছু বাড়ি ও জমি দেওয়া হলো কৃষি ও অগ্রাগ্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিক্ষা কেন্দ্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কল কারখানাকে। কিছু বাড়ি রইল চাকুবীজীবীদের জন্য। এসব বাড়ির ভাড়া ঠিক হলো বাড়ির গঠন অনুযায়ী। বাড়ি সব ভরে উঠল - বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ হলো ফুলিয়া উপনগরীতে। এই পরিকল্পনার সাথে রাখা হলো ভবিষ্যতের আরও কিছু পরিকল্পনা এবং তার সংস্থান জমি ইত্যাদি। ফুলিয়ায় হলো

পাকা রাস্তা। জন সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক আলো। ফুলিয়াই হলো টাঙ্গাইল শাড়ির মূল কেন্দ্রস্থল। কারণ পূর্ববঙ্গের ঐ এলাকার বহু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হলো এই ফুলিয়ায়।

ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এই উপনগরীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হলো ব্লক অফিস এবং ব্লক অফিসারই হলেন এই উপনগরীর প্রশাসক। এরও উদ্দেশ্য ছিল এই উপনগরীর উন্নতি এবং পরিকল্পনার সূচু রূপায়ণ। আমি উপনগরীর প্রশাসক ছিলাম ১৯৭১-১৯৭৬ জামুয়ারি পর্যন্ত। এই উপনগরীর সার্থক রূপায়ণ এখনও অসম্পূর্ণ। এই উপনগরীতে এখনও অনেক কাজ বাকি। বেশ কিছু বাস্তবজমি আছে এখানে এই জমির বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন কল কারখানা গড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এ জায়গাও জমি আছে। এসব না হলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবেনা। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না হলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবেনা। আরও একটা কাজ বাড়িগুলির সূচু বন্টন এবং তার দলিল প্রদান। একদিন যে উদ্বাস্তু ছিল এখনও তার সেই আখ্যা শোভা পায়না।

আরও অনেক কাজের সাথে এই কাজগুলি দ্রুত করা প্রয়োজন অন্ত্যয় ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হবে। এই সব কাজের সূচু রূপায়ণ না হলে, কাজগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী না হলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হবে এই উপনগরীতে এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে।

এই সব সমস্যা মীমা সার সাথে বাজার হাট, কল কারখানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদির সূচু পরিচালনার ব্যবস্থাও প্রয়োজন এবং ঐ সাথে প্রয়োজন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। এই কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যম সৃষ্টি শিল্প, কৃষি, ফল চাষ, ফল সংরক্ষণ এবং ছুফ জাতীয় প্রকল্প হওয়া সম্ভব। এইভাবে পরিকল্পনা সার্থক রূপায়ণে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ফুলিয়া সত্যই আদর্শ উপনগরী হোক ভরে উঠুক প্রাণ প্রাচুর্যে।

ফুলিয়ার আদিবাসী

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

ফুলিয়ার আদিবাসী সম্পর্কে কোন কিছু লেখার আগে আদিবাসী কারা সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়োজন। আর্যরা যখন বীণ্ড্রীষ্টের জন্মের ২০০০ বছর আগে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে তখন এ দেশে বসবাসকারী ড্রাবিড়দের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই ড্রাবিড়রা পরাজিত হয় এবং পাহাড় বা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এরা অসভ্য এবং এরাই আদিবাসী।

ফুলিয়ায় আদিবাসী কমবেশী সব গ্রামেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আদিবাসীদের সংখ্যা বেলগড়িয়া ও নবলা অঞ্চলেই বেশী। বেলগড়িয়া অঞ্চলের বেলগড়িয়া গ্রামে, মালিপোতা গ্রামে, ও কুঠিরপাড়া গ্রামে, পুমুলিয়া গ্রামে এবং নবলা অঞ্চলে শিমুলিয়া গ্রামে ও নবলা গ্রামের কথা লিখছি। ফুলিয়ার আদিবাসী মূলতঃ সর্দার ও দুর্লভ নামেই পরিচিত।

ফুলিয়ার আদিবাসীরা কিভাবে ফুলিয়ায় এল সে কথা বোধ হয় অনেকেরই জ্ঞান নেই। আজ থেকে ১০০ বছর পেছনে এই ফুলিয়ার বেলগড়িয়া অঞ্চলের কুঠিরপাড়া গ্রামে ইংরেজদের নীলকুঠি ছিল। সেই নীলকুঠির চিহ্ন এখন নেই। গঙ্গা গর্ভে। কুঠির পাড়া গ্রামের অস্তিত্ব অল্প আছে। নীলচাষের জন্য শ্রমিক প্রয়োজন। কোথায় পাবে স্থানীয় শ্রমিক? ওদের যে সবাই ভয় করত। তাই ইংরেজরা উপায় না দেখে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এই আদিবাসীদের ধরে নিয়ে আসে। এরা রাঢ় ভূমির আদিবাসী হলেও দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল। মেদিনীপুরের আদিবাসীরা আলাদা স্বভাবের ও আলাদা ভাবে বসবাস করতে থাকে। প্রত্যেক পরিবার পিছু কয়েক বিঘা করে জমিও দেওয়া হল যাতে ঘাঘাবর জীবন ত্যাগ করে কৃষি নির্ভরশীল সামাজিক জীবনযাপন করে।

এরা বাংলা ভাষা রপ্ত করল, কারণ এরা জাতীতে সাঁওতাল ছিল। সামাজিক জীবন যাপনে বেশ পটু হয়ে উঠল। একেকটা সর্দারকে নিয়ে একেকটা গোষ্ঠী ভাগ হয়ে গেল। সর্দাররা ইরেজদের গোলাম ছিল। কার্য সিদ্ধির জন্য সর্দারদের লেঠেলি কাজেও লাগাত। এই সর্দারদের বংশধরেরা সর্দার উপাধি পেল ও আজকালের ফুলিয়ার সর্দাররা এদেরই বংশধর। বর্তমানে এই সর্দাররা রায় কিংবা বিশ্বাস বাগদী উপাধীও দিয়ে থাকে। মালিপোতা গ্রামে প্রায় ২৫০ জন শিমুলিয়া গ্রামে প্রায় ১০০ জন, পুমুলিয়া গ্রামে প্রায় ৩০ জন, বুঁইচা গ্রামে অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে।

যারা মেদিনীপুরের আদিবাসী তারা নীলচাষে শ্রমিকের কাজ পছন্দ করল না। তারা সর্দারদের সমাজ থেকে পৃথক হয়ে আলাদা উপজীবিকা গ্রহণ করল। সেই সময় ফুলিয়ায় অনেক ছোটবড় জমিদারের বসবাস ছিল। এই জমিদাররা এদের বাড়ী করার জমি দিলেন। এরা নিজ নিজ ঘর বানাল ও জমিদার বাড়ীর পাল্কি বাহকের কাজ নিল। পাল্কির অপর নাম তুল্কি। তুল্কি বাহক বলে এদের “তুলে” বলা হত। এখন যারা তুল্লভ সবাই কিন্তু জাতীতে তুলে। এরা কিন্তু কৃষি নির্ভরশীল ছিলনা। ফুলিয়ার জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তু শিকার করত। এই তুলে জাতীদের স্বাধীনতা সর্দারদের থেকে অনেক বেশী। আজও মেয়েরা চাটবাজার করে। বেলগড়িয়া গ্রামে প্রায় ২০০ জন ও শিমুলিয়া গ্রামে ১৫০ জন বসবাস করছে। অন্যান্য গ্রামেও যে কম বেশী নেই তা নয়।

এখন সর্দার ও তুল্লভদের নিয়ে একটা পরিসংখ্যানমূলক আলোচনায় আসা যাক।

আকৃতি :—এই আদিবাসীদের গায়ের রং উজ্জল শ্যামবর্ণ। নাক চ্যাপটা। মুখমণ্ডল গোলাকার। এরা সবাই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। বেশীর ভাগেরই উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ২ ইঞ্চি তবে অনেকে ৬ ফুটের কাছাকাছিও আছে।

বাসস্থান—সবারই নিজ নিজ বাসস্থান আছে। সমাজের মধ্যেই

বসবাস করে। বাড়ী মাটির দেওয়ালের ও খড়ের চালের।
পোশাক পরিচ্ছদ—আধুনিক সু-সভ্য বাঙালী পোশাক।

শিক্ষা—শিক্ষার শতকরা হার ৫। (যাদের আক্ষরিক পরিচয় আছে
তাদেরই শিক্ষিত ধরা হল।) মেয়েরা সবাই অশিক্ষিত।

পেশা—এরা এখন সবাই কৃষিজীবী। নিজ জমি চাষ করে শতকরা
১০ জন বাকী ৯০ জনই কৃষক বাড়ীতে কাজ করে দিন আনে
দিন খায়। ভাগচাষীও কিছু আছে। ভাগচাষীর সংখ্যা
প্রায় শতকরা ১৫ জন।

ধর্ম—এরা ধর্মভীরু। ধর্মদেবতার পূজা করে। ধর্মদেবতা কোন
বিশেষ গাছ। পূজা হয় সূর্য উদয়ের আগে। পূজায় পাঁঠা
বলি চাই। পাঁঠা বলির মাংস বিলিয়ে দেয়। মনসাঠাকুরের
খুব ভক্ত। মনসা পূজার ষট আগের দিন জলে ডুবিয়ে দিয়ে
আসে। পূজার দিনে সেই ষট এক ডুবে তুলে
নিয়ে এসে পূজার বেদিতে স্থাপন করে। সারারাত পূজা
হয়। গান গায়। মনসা পূজায় যাপান গান খুব প্রিয়।
“যাপান” হল মনসামঙ্গলের কবিগান। চণ্ডীপূজাও করে।
ঠাকুর-গড়িয়ে পূজা করার চেয়ে গাছকে প্রতীক করে পূজা করা
খুব প্রচলিত। আজকাল এরা সু-সভ্য। এরা আমাদের
মতনই সব পূজা করে। সরস্বতী পূজা করতেও দেখা যায়।
বেলগড়িয়া গ্রামে দুর্লভরা অল্পসংখ্যে দুর্গাপূজা করে।
এই পূজা প্রায় ২০ বৎসর আগে ভোলা দুর্লভ স্থাপন
করেছিল। আজও সেইভাবে পূজা হয়ে আসছে। শিমুলিয়ার
দুর্লভরা প্রতিবছর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা করে। এরা
কালীপূজাও করে। মালিপোতার সর্দাররা প্রতিবছর
সরস্বতী পূজা করে।

উৎসব—এরা উৎসব প্রিয়। সারাদিন কর্মক্রান্ত হয়ে বাড়ী এলেও
সন্ধ্যার শেষে চোল বাজিয়ে নাচগান করতে ভালেনা।
সমস্তা জর্জরিত জীবনে এই আনন্দটুকু নিংড়ে নিতে এরাই
জানে। চড়কে এরা সং সাজে। বাড়ীতে বাড়ীতে
রাধাকৃষ্ণের গান গেয়ে যে পয়সা পায় তা দ্বিগুণ মকর

সংক্রান্তির দিনে “রামসাগরের” ধারে বনভোজন করে। রামসাগর একটা বিলের নাম। রাসের সময় এরা কেউ বাড়ীতে থাকেনা সবাই শাস্তিপুরে চলে যায়। রাসে ময়ূর পঙ্খিতে উঠতে খুব ভালোবাসে। যত হাওদা ও যত ঠাকুর আছে এরাই কাঁধে করে বয়। উপার্জনও হয় আনন্দও হয়। কালীপূজায় ঠাকুর বাহকের কাজ এরাই করে। অর্থটা সব নয়, এতে আনন্দ আছে। নেশা করতে ভালোবাসে, নেশাতেই আনন্দ। বিয়েতে সারারাত গান আর গান। ছেলের বাবাকেই টাকা দিতে হতো কিন্তু এখন মেয়ের বাবাকেই পণের টাকা দিতে হয়। আধুনিক ছাঁচে সব পালটে গেছে।

ভাষা—সাঁওতালি টান আছে। যাবনাকে বলে “যাবক নাই” নেবনাকে বলে “লিবক নাই।” “এদিকে এসনা” এটার উচ্চারণ হবে “ইধারে এসনাই কেন।” এটাকে বলে “ইটা” সেটাকে বলে “সিটা”। “কোথায়” কে বলে “কমনে” “রেখেছিস” কে বলে “রেখেলি”।

আচার—এরা এখনো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এরা কৃত্তের ভয় করে। তুক্ তাক্ ফুক্ ফাক্, জলপোড়া, বান্‌মারা, ঝাঝা এখনও প্রচলিত। সাপে কামড়ালে ওঝা ডাকে। ওঝা ঝাড়িয়ে ভালো করে। মাদুলিতে এদের বিশ্বাস। গাছের ঔষধি গুলনাগুল এরা ভালো করে জানে।

আর একটা কথা না লিখলে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এদের সরলতা সেই জানে-যে অন্তর এদের অন্তরে মেশাতে পেরেছে। আমি এদের মধ্যে থাকি এদের নিয়ে বাস করি তাই এদের অন্তরের পরিচয় আমার জানা। এরা কখন অকারণে অপরের ক্ষতি করেনা। বেইমানদের সাজাদিতে জানে। বিপদে অপরকে সাহায্য করতে এদের কোন কুঠা নেই। বন্ধুর জন্তু জীবন দিতেও পিছুপা নয়।

ফুলিয়ার তাঁত শিল্পে সমবায়ের ভূমিকা

হরিপদ বসাক

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বিলেতের রচ্ডেলে সমবায়ের জন্ম হয়। রচ্ডেলের কয়েকজন তাঁতি তাদের সমবেত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মূলধন নিয়ে গঠন করেন একটি ক্রেতা-সমবায়, সূচনা হয় অর্থনীতির একটি নতুন ধারার। ক্রেতা সমবায় দিয়ে শুরু হলেও আজ সেই সমবায় মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার একমাত্র পথ, এই সমবায় দরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বী হবার একমাত্র পন্থা বলে স্বীকৃত।

রচ্ডেলের সমবায়ের সেই উদ্যোক্তাদেরকে তাই সমবায়ের অগ্রদূত বলে আখ্যাত করা হয়।

ফুলিয়ার তত্ত্ববায় সমবায় আন্দোলন বিষয়ের সঙ্গে রচ্ডেলের ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেননা তত্ত্ববায় সমবায় বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে সেই অগ্রদূতদের দ্বারা গঠিত সমবায়ের কোন সাদৃশ্য নেই। উল্লেখ্য এই জন্মই, সেই সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিলো তত্ত্বজীবীদের দ্বারা।

হ্যাঁ, এইটুকু উল্লেখের জন্ম রচ্ডেলের কথার অবতারণা। রচ্ডেলের অগ্রদূতেরা প্রতিটি সমবায়ী মানুষের নমস্কৃত—নমস্কৃত তত্ত্ববায় সমবায়ীদের কাছেও। তবে সমবায়ের বিশ্বাসী তত্ত্বজীবীরা একটু অতিরিক্ত গর্ববোধ করে থাকেন এই ভেবে, রচ্ডেলের পাইওনিয়াররা পেশায় তাদের মতোই তত্ত্বজীবী ছিলেন।

সমবায়ের জয়যাত্রার শুরু তখন থেকেই অবশ্য সে—যাত্রাপথ সর্বত্র কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না। গরীব খেটে খাওয়া মানুষের জন্ম এই আন্দোলন প্রায়শঃই বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ধনী মহাজন শ্রেণী যারা গরীব শ্রমিকের শ্রাস্য পাওনা চুরি করে মুনাফার পাহাড় গড়েন, তারা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। তত্ত্বজীবীদের মধ্যেও সমবায়ের আগমন সহজ পথে হয়নি। মহাজন—শ্রমের নাগপাশে বাঁধা তাঁতির মুক্তির পথের কথা ভাবতেই পারতেন না।

কদিন আগেও। দীর্ঘদিন তারা সমবায়ের ছত্রছায়ায় আসতে সন্দেহের দোলায় ছুঁলেছেন।

আমাদের দেশে সমবায়ের ব্যাপকতা জার্মান জাপান রাশিয়া ইজরায়েল প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক কম—যদিও সমবায়ের সম্ভাবনা ওই সব দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অনেক বেশি। পাঞ্চাব মহারাষ্ট্রে চাষের ক্ষেত্রে সমবায় কিছুটা এগিয়েছে, তাঁতের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র কিছুটা অগ্রসর হয়েছে মাত্র।

মহাজনের পদানত এদেশের তাঁতি সমাজে সমবায়ের চেতনা আজো তেমন ভাবে জাগরিত হতে পারেনি। সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে অনেক। তাঁতিদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে কিন্তু মহাজনদের আগ্রাসনের সামনে তা দাঁড়াতে পারেনি।

এক সমস্ত মহাজন নিজেরাই সমবায় সমিতি গঠন করে তাঁতি-কল্যাণের ভেকু খারণ করে শোষণের নতুন রাস্তার প্রবর্তন করেন। ফলে স্বতন্ত্র গজিয়ে ওঠা অসংখ্য তাঁত—সমবয়ে তাঁতিরা যোগদান করে আশাহত হয়ে ফিরে আসেন, সমবায়ের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের ইতিহাস দীর্ঘ নয়। মাত্র তিন দশক আগে ফুলিয়া উপনগরীতে ওপার বাংলার টাঙ্গাইল থেকে আগত কয়েকজন তাঁতশিল্পী এই শিল্পের সূচনা করেন।

১৯৫০-৫১ সালে, তখনো ফুলিয়ার উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন কলোনী তৈরী শেষ হয়নি, স্থির হলো, এখানে পূর্ববাংলার ঢাকা ও টাঙ্গাইল থেকে আগত ২৫০টি অতি মিহি সূতার বস্ত্র বয়নকারী তাঁতি পরিবারকে স্থান দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব দেন পরাধীন ভারতের অনুশীলন দলের সদস্য এবং বিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ঢাকার গোপাল বসাক। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ফুলিয়া উপনগরীর রূপকার ভারত সরকারের উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন দপ্তরের তৎকালীন উপদেষ্টা এস. কে. দে এবং ফুলিয়া উপনগরীর প্রশাসক পি. গুহঠাকুরতা এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

পরে অবশ্য অশ্রু পেশার কিছু উদ্বাস্ত বারা এই উপনগরীতে পুনর্বাসনের আশায় স্থান নিয়েছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন ৫০০ ঘর উদ্বাস্তদের মধ্যে ২৫০ ঘরই যদি তাঁতি বাস করে তবে সমাজটা বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে কারণ এদের মতে তাঁতিরা গরীব এবং বর্বর।) তাদের চাপে তাঁতি পরিবারের সংখ্যা কমিয়া অর্ধেক (১২৫ ঘর) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উদ্বাস্ত তাঁতিরা আসতে শুরু করেন। টাঙ্গাইল থেকে আসেন কাস্তি বসাক ১৯৫১ সালে। তারপর আসেন ভূপতি বসাক, কানাই বসাক এবং আরো অনেকে। ঢাকা থেকে গৌসাই দাস বসাক এসেছিলেন অল্প ক’দিনের জন্য, তবে ঢাকার ছ’ চারজন বারা এসেছিলেন তাঁরা ক্রমে ঢাকাই শাড়ি বয়ন ছেড়ে টাঙ্গাইল বুনতে শুরু করেন এবং টাঙ্গাইল তাঁতিবনে যান।

প্রথমে তাঁতিদের থাকবার জন্য খড়ের চালা, পরে লম্বা করে টিনের চালা করে দেওয়া হয়। ফুলিয়া পলিটেকনিকের ঘরবাড়ী তখন প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। এই পলিটেকনিকের একটি বড় ঘরে তাঁতি বসানো হয় কয়েকখানা। আর এই সকল তাঁতের সূতা যোগানো, তাঁতির মুজুরীর ব্যবস্থা এবং তৈরী কাপড় বাজারজাত করার দায়িত্ব বহনের জম্মই গঠন করা হয় “ফুলিয়া টেক্সটাইল ওয়াকার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি” নামে একটি সমবায় সমিতি। তন্তুজীবীদের মধ্যে তো বটেই সম্ভবতঃ ফুলিয়াতে এটাই সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি। তন্তুবায়রাই এর সদস্য ছিলেন, সম্পাদক ছিলেন গোপাল বসাক, সহ-সম্পাদক নরেশ চন্দ্র বসাক, এঁদেরকে ফুলিয়ার সমবায়ের অগ্রদূত বলাটা অতুক্তি হবে না। ফুলিয়া উপনগরীর প্রশাসনই এই সমিতিকে আর্থিক সহযোগিতা দান করেন। শতাধিক সদস্য নিয়ে এই সমিতি সাফল্য জনক ভাবে বড়র ঢুয়েক কাজ করেন।

তারপর ১৯৫৩ সালে যেই রাজ্যব্যাপী চরম মন্দার সময় যখন সমিতির পক্ষে সূতা জোগাড় করা এবং তৈরী বস্ত্র বিপণন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সমিতি বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ

বলা চলে ফুলিয়ায় এই সময় আরো যে সকল শিল্প চলছিলো যেমন শীট মেটাল, হোসিয়ারী, টেক্সটাইল, সাধান তৈরী প্রভৃতিও মন্দার কবলে পড়ে। কয়েকটি তখনই বন্ধ হয়ে যায় বাকীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই সময়ই সমিতির কর্মকর্তাদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় পশ্চিমবাংলার তৎকালীন সমবায় নিয়ামক মহেন্দ্র চৌধুরীর তদ্বাবধানে তদন্ত চল, হিসাব অডিট হয়। তদন্তে অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

ফুলিয়ার তত্ত্বাবায় সমবায়ের প্রথম উদ্যোগ এই ভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

তারপর দীর্ঘদিন তাঁতিরা মহাজনের অধীনে দিন কাটান।

ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটা তাঁত—সমবায় গঠিত হয়ে যথারীতি সদস্য সংগ্রহ, মূলধন জোগাড় সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে সমিতি চলতে থাকে। কিন্তু তার সবই সংগঠকদের দু'একজনের ব্যক্তিগত ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়। দরিজ্র তাঁতিদের কোন কল্যাণই তাতে সাধিত হয়নি, উণ্টে প্রবঞ্চিত হয়ে তাঁতিরা সমবায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ফুলিয়ার সমস্ত তাঁতি তখন মহাজনের করতলগত হয়ে প্রবলভাবে শোষিত হতে থাকে।

১৯৭২ সালে ফুলিয়া উপনগরী ও তার চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁতি সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ হাজারের উপর। এই সময় এলো আবার দুর্দিন। মহাজনী শোষণ পৌঁছে গেছে চরম সীমায় মজুরী কমতে কমতে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো তখন তাঁতে আর তাঁতিদের ভাত হয় না। কিছু তাঁতি বাধ্য হন বাংলাদেশে ফিরে যেতে। বাকী যারা ছিলেন তারাও তিন পুরুষের সনাতন বয়ন-শিল্প পরিত্যাগ করে অস্থায়ী পেশার কথা ভাবতে শুরু করেন, কেউ কেউ তাঁত নাকু ফেলে কাস্তে কোদাল হাতে দিন-মজুরীতে নেমে পড়েন।

এ সময় তাঁতিদের কয়েকজন নেতৃদাতার ব্যক্তি বাঁচার লড়াইয়ে মাঠে নামেন আন্দোলনের ডাক দেন, তাঁতিদের সংঘবদ্ধ

করেন। চলে মিছিল প্রোগান, স্থানীয় 'হাণ্ডলুম অফিস',
বিডিও'র অফিস প্রভৃতি ঘেরাও করা হয়, অভিযান চলে রাজভবন
পর্যন্ত। ফুলিয়ার সব তত্ত্বজীবী এই আন্দোলনে অংশ নেন।
যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে প্রভাত কুমার বসাক অগ্রাভূত।

ফুলিয়ার এই অস্থির অবস্থার কথা জেনে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অফ ইণ্ডিয়ার শাস্তিপুর শাখার তৎকালীন এজেন্ট তারাকান্ত বাগ্‌চী
আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে আসেন ফুলিয়ার তাঁতিদের কাছে।
তিনি পরামর্শ দেন সকলে সমবেত ভাবে এমন একটি সমিতি
গঠন করতে যা হবে তাঁতিদের নিজস্ব সংস্থা তাঁতিরাই হবে যার
মাসিক এবং শ্রমিক। প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য তাঁর ব্যাঙ্ক দেবে।

১৯৭০ এ গঠিত হলো ফুলিয়ার তত্ত্ববায়দের নতুন সংগঠন
'ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প সমিতি'। শ্রীবাগ্‌চির প্রত্যক্ষ
তত্ত্বাবধানে এই সমিতি কাজ আরম্ভ করে, শুরুতে সদস্য সংখ্যা ৭৫
জন। সাড়া মিললো সর্বমহল থেকে, তাঁতিরা অধিক সংখ্যায়
সমিতিভুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ১৯৭৪ সালে অল্পরূপ
আরেকটি সংস্থা করা হয়। তার নাম 'টাঙ্গাইল তত্ত্বজীবী উন্নয়ন
সমিতি।'

এই সমিতিদ্বয় গঠন করার ফলেই ফুলিয়ার তাঁতিরা সে
যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন, রক্ষা পেয়েছিলো টাঙ্গাইল শাড়ি শিল্প
নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে।

এই সমিতি গঠন স্থানীয় মহাজনরা ভালো চোখে দেখেন
নি, কারণ সমিতি টাঙ্গাইল শাড়ির ব্যবসায় নেমে তাদের মুনাফা
লোটার সুযোগ অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছে।

নানা সুবিধা অসুবিধার মধ্য দিয়ে সমিতি দু'টি বছর চারেক
কাজ চালিয়ে যায় সফল ভাবে। এই সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা
ছিলো ১২৫ জন, তাঁত সংখ্যা ৩০০ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার
লগ্নীর পরিমান সাত লক্ষ টাকা।

১৯৭৭ সালে টাঙ্গাইল শাড়ি শিল্পে আসে মন্দা, কাঁচা মালের
প্রচণ্ড অভাব। তাঁত প্রায় অচল হবার মতো অবস্থা। এ সময়

সমিতি দু'টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারী সহযোগিতা অনিবার্হ হয়ে পড়ে। বাজারের সুবিধা, কাঁচামালের জোগান এবং কিছু সরকারী অর্থ সাহায্যের নিশ্চয়তা পেতে এই সমিতি দু'টিকে ভেঙ্গে তিনটে সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করা হয়। সমিতি তিনটির নাম ১) ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ ২) টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এবং ৩) নূতন ফুলিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ। এই সমবায়ের রূপান্তর সমিতিগুলিকে এনে দেয় একটি সুস্থির অবস্থা, রাড়ে বাজারের সুবিধা। শীর্ষ সমিতি উৎপাদিত বস্ত্র বাজারজাত করার এবং প্রয়োজনীয় সূতোর জোগানের নিশ্চয়তা দেওয়াতে এবং সরকারী সাহায্য ও ব্যাঙ্কের ঋণ প্রয়োজন মাসিক বৃদ্ধি হওয়ায় সমিতিগুলির ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে দ্রুত। তাঁতিদের মুজুরী বাড়ে অগ্ন্যন্ত সুবিধাও। ফলে ১৯৭৩ সালের ফুলিয়ার ভেঙ্গে পড়া তাঁতশিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা ধীরে ধীরে সফল হয়ে ওঠে। আজ সেই অর্থনীতি যথেষ্ট সতেজ। ফুলিয়ার সমগ্র অর্থনীতিতে তাঁতশিল্পের ভূমিকা অনেকখানি।

ফুলিয়ায় বর্তমান তাঁত সংখ্যা ৬ হাজারের উপর প্রায় দু'হাজার তাঁতি পরিবারের ১৫ হাজার সদস্য এই জীবিকার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

সমবায়ীদের প্রচেষ্টায় টাঙ্গাইল শাড়ি শিল্পের বাজার প্রসারিত হচ্ছে, চাহিদা বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে শাড়ির মান, রং ও ডিজাইনের মনোহারিত্ব। আধুনিকতার দূর পাল্লার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় যে কোন শাড়ি শিল্পের সঙ্গে এই টাঙ্গাইল শাড়ি আজ সক্ষম প্রতিযোগী।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তন্তুবায় সমবায় সমিতি (শীর্ষ সমিতি) ফুলিয়ার সমিতিত্রয়ের উৎপাদনের ৬০% ক্রয় করে বাজার জাত করেন। তাছাড়া অগ্ন্যন্ত সরকারী ও সমবায় সংস্থাও এদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উন্নতমানের টাঙ্গাইল শাড়ি ক্রয় করে থাকেন।

সরকারী সাহায্যও আসছে শেষারে অংশ গ্রহণ, উন্নত তাঁত সরঞ্জাম ক্রয় শেষার মূলধন ঋণ ইত্যাদি খাতে ঋণদাতাব্যাহকও

সহযোগিতা বৃদ্ধি করে চলেছেন। ফুলিয়ার তিনটি সমিতিতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লগ্নীর পরিমাণ এবছরে ৩০ লক্ষ টাকা।

ফুলিয়ার তত্ত্বাবধানের মাঝে সমবায় আন্দোলন আরো ব্যাপকতর করার সুযোগ রয়েছে। তিনটি সমিতি মাত্র ৬১৬ জন তাঁতিকে সমবায়ভুক্ত করতে পেরেছে। ফুলিয়ার সমগ্র তাঁতি সংখ্যার ১০% মাত্র। ফুলিয়ার অধিকাংশ তাঁতিই আজ সমবায়ের ছত্র ছায়ায় আসতে আগ্রহী। সেজন্য সমবায় সমিতি গড়ার নতুন উদ্যোগ নেওয়া দরকার। বছর খানেক আগে ‘ফুলিয়া তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি’ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়ে কাজ শুরু করেছে প্রাথমিক ভাবে। তাঁতহীন তাঁতিদের জন্যও একটি সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে। উদ্যোগ আরো বৃহৎ হওয়া আবশ্যিক।

সমবায় ফুলিয়ার তাঁতশিল্পে যে সম্ভাবনা তৈরী করেছে তা যদি টিকিয়ে রাখা যায়, সমবায় উদ্যোগ সং ও বলিষ্ঠ ভাবে গ্রহণ করে আরো অধিক সংখ্যায় তত্ত্বজীবীকে দলে টানা যায় তবে একদিন দেখা যাবে সমগ্র ফুলিয়ার তাঁতশিল্পই সমবায়ের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে। ফুলিয়া তখন সমবায় অর্থনীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে সারাদেশে প্রতিভাও হবে। শিল্প ও সম্পদে কবি কুস্তিবাসের ‘গ্রামরত্ন ফুলিয়া’ আবার তার হৃত সুনাম ফিরে পাবে।

ফুলিয়ার ভবিষ্যত সম্পর্কে কয়েকটি কথা

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষকে ছুঁতুকরো করে ভারত আর পাকিস্তান তৈরী হ'ল। এই ভাগের বিনিময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলাম। আর পেলাম উদ্বাস্তু আখ্যা, পরে ঐ পাকিস্তানই আবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। ফলে আবার উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ফুলিয়াতে আংশিকভাবে হ'লেও হয়েছে। কিন্তু এই সামান্য অশেষ চাপেই ফুলিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা টলে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ফুলিয়ার উন্নতির সম্ভাবনা কি আছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

এবার অতীতের দিকে একটু তাকাই। প্রথমতঃ দেখি ফুলিয়া বর্ধিষ্ণু জনপদ। তারপর দেখি পেটের রোগ ও কলেরায় সেই জনপদ ধ্বংস হয়ে কিছু অংশ কোনক্রমে টিকে আছে। ফলে জমি সবই পতিত অবস্থায় ছিল। এই অবস্থায় উদ্বাস্তুরা আসল। সরকারী উপনগরী যেমন তাদের জন্ম গড়ে উঠল তেমনি তার থেকেও অনেক বেশী গ্রাম ঐ উদ্বাস্তুদের নিয়ে গড়ে উঠল সরকারী সাহায্যের বাইরে।

এই অবস্থায় ফুলিয়াতে গড়ে উঠল—কাপড়ের মিল, সিট্‌মেটাল কারখানা, সাবানের কারখানা, ইট তৈরীর কারখানা, পলিটেকনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বীজ উৎপাদন খামার, বিজ্ঞালয়, সেচের পাইপ তৈরীর কারখানা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচালির কারখানা আর ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা।

এখন কি আছে? বহুখাভিভুক্ত রুগ্ন কাপড়ের মিল, দৃষ্টির অগোচরে সিট্‌মেটাল কারখানা আর কয়েকজনের চাকুরী বাঁচাতে পলিটেকনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও বীজ উৎপাদন সরকারী খামার। এগুলির দ্বারা সামাজিক সেবা খুব কমই পাওয়া যায়। এমনকি বলা যায় উল্লেখ করবার মত

নয়। কিন্তু বাড়ীগুলি আছে বলে উল্লেখ করতে হ'ল।

বিদ্যালয় প্রথমে ছিল দুইটি। কুস্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয় ও শিক্ষানিকেতন। আজ থেকে বেশ কয়েক বৎসর আগে মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় তৈরী হয়েছে। ফলে এখন তিনটি বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় বেশ কয়েকটি আছে।

এই অবস্থার উপর উন্নতির কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। এই চিত্র থেকে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ফুলিয়ায় উন্নতির ধারা যে শুধু ব্যহত হয়েছে তাই নয়, অবক্ষয়ের দিকে প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। এর মধ্যে হস্তচালিত তাঁত কিছু আশার কথা চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করছে। তবে এটা সত্য এককভাবে কোন একটা দিক বেশী দিন উন্নতি করতে পারে না বা টিকে থাকতেও পারে না।

ফুলিয়াতে সূতোর কারখানা তৈরী করবার পরিকল্পনা সরকারের ছিল। হয় নি। নাটবন্টু তৈরী করবার কারখানা হওয়ার কথা ছিল। হয় নি। বর্তমানে সূতো তৈরী করবার কারখানার চাহিদা ফুলিয়াতে প্রচুর বেড়েছে। এটা করা একান্ত প্রয়োজন। উপনগরী এগারকার অনেক জায়গা কারখানা করবার জন্য চিহ্নিত। সেই জায়গাগুলি যদি সরকারী নিয়মকানুন শিথিল করে যথাযথ বিলিভটন করা যায় তবে অনেক কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে আসার পর এবং পঞ্চায়তগুলি পুনর্গঠন করার ফলে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। হিমঘর নানা ক্ষেত্রে পাকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। সেটা বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। সমবায়ভিত্তিক তাঁতবস্ত্র সংক্রান্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হচ্ছে। একটা তাঁতবিহীন শ্রমিকদের তাঁত দেওয়া হচ্ছে অত্রটি তাঁতবস্ত্র সংক্রান্ত বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। তন্তুজীবির সমবায় ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে পলিয়েষ্টার বস্ত্র ও তাঁতে তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাজারের ব্যাপক পুনর্গঠন কার্য সমাধা করে প্রায় চাহিদামত রূপদান করা সম্ভব হয়েছে।

যে সমস্ত কারখানাগুলি নানা কারণে বন্ধ হয়ে আছে সেগুলির জায়গা সরকার থেকে গ্রহণ করে নতুন ভাবে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যেমন পাইপ কারখানা। অনেকটা স্থান অঘণা পড়ে আছে। সরকারী বীজ খামারেরও ব্যাপক সংস্কার করা দরকার। দুইটি গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্ত বরাদ্দকৃত অনেকটা স্থান ও বাড়ী অঘণা নষ্ট হচ্ছে পরিকল্পনার অভাবে। সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা দরকার। ফুলিয়ার জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তার কর্মকাণ্ড যেহায়ে বেড়েছে তাতে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে “প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র” হিসাবে গড়ে তোলা দরকার এক্ষুনি। উচ্চ বিদ্যালয়ের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে জরুরীভাবেই।

এবারে ফুলিয়ার সবচেয়ে বড় দিকটি তুলে ধরতে চাই। সেটা হচ্ছে কৃষি। অধিকাংশ মানুষই এখানে কৃষি নির্ভর। অথচ ফুলিয়ার ভবিষ্যত উন্নতির কথা চিন্তা করবার সময় এই কথাটাই আমরা ভুলে থাকি। আমরা সৌম্যবদ্ধ মধ্যবিত্ত চিন্তা ভাবনায় শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বৃদ্ধির বিকাশকেই উন্নতির পথ বলে মনে করি। এটা সত্য নয়। আর সত্য নয় বলেই যেমন ফুলিয়া ধুকছে তেমনি সমগ্র দেশ ধুকছে।

ফুলিয়া এলাকার বেশীরভাগ জমিই বেলেমাটি। এই বেলেমাটিতে গভীর নলকূপ, খালো পাম্প, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োগ করে যে ফসল উৎপাদন করছি তাতে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশী হয়ে পড়েছে। আর বিশেষ করে ধান, পাট ও বিশেষ পরিচিত কয়েকটি মাত্র শাকসব্জীর চাষ হচ্ছে গতানুগতিক ব্যবস্থায়। ফলে চাষের নান্দিস্বাস উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একান্ত দরকার। অমুর্বর জমিতে ব্যয় বহুল ঐ নির্দিষ্ট ফসলগুলির চাষ মাত্র করে চললে চাষীকে মার খেতে হবেই। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে পশুপালনের দিকে নিজেদের নজর ফেরানোর। অমুর্বর জমিতে অল্প ব্যয়ে পশুদের উপযুক্ত খাবার তৈরী করে পশুপালন আরম্ভ করতে হবে। শুধুমাত্র গভীর

নলকূপ ও শ্রাণো পাম্পের উপর নির্ভর না করে খাল বিলগুলি সংস্কার করে সেচের জন্ত জল ধরে রাখতে হবে। সবচেয়ে সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে, পরিকল্পনার মাধ্যমে গঙ্গা ও চূর্ণর মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব। বিলগুলির অবস্থান এই কাজকে সহজ করে তুলেছে। দরকার পরিকল্পনার ও চাষীদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর। যদি চেষ্টা করেও এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটানো না যায় তবে আইন করে বা স শোধন করে এই কাজকে রূপ দিতে হবে। কৃষিকাজকে লাভজনক করতে হবেই আর তার প্রসার ঘটাতে হবেই। শিল্পজাত দ্রব্যের মাধ্যমে মানুষ আনুসঙ্গিক প্রয়োজন মিটাতে পারে। কিন্তু বাঁচতে হলে কৃষি কাজের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। এই সংস্কার কাজের দ্বারা ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষ করা সম্ভব হবে, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং লাভ জনক।

এখন দেখা প্রয়োজন শিল্প এবং কৃষির মধ্যে আনুপাতিক সমন্বয় কিভাবে ঘটানো যায়। ফুলিয়ার অনেক বালি জমি কৃষি থেকে তাঁতে ব্যবহার করার ফলে ঐ জমি থেকে আয় অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এই প্রকারে উন্নত মানের জমিতে পরিকল্পিত চাষ এবং অমুর্বর জমিতে কৃষি সহায়ক শিল্প অথবা অর্থকরী চাষ (যেমন, গুটিপোকাকর চাষ আরম্ভ হয়েছে) ও পশুপালন ইত্যাদি করা দরকার। ফুলিয়ায় চাষ বা অশ্রু কাজে শ্রমিকের অভাব নাই। অভাব আছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থাপকের। আশা করি প্রয়োজনের তাগিদে সে অভাবও পূর্ণ হবে যদি সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

ফুলিয়ার উন্নতির জন্ত কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারেরই সহযোগিতার প্রয়োজন। কারণ শিল্পস্থাপনের উপযুক্ত জমি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে জমি পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবেই। নতুবা শিল্পস্থাপনের জন্ত নির্দিষ্ট স্থান কেন্দ্রীয় সরকারের বিনা অনুমতিতেই পরিকল্পনাহীন এবং অনুৎপাদনশীল কাজে যথেষ্ট জ্বর দখল হয়ে যাবে। যার সূচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। অতএব সর্বোত্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করা উচিত। এইভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ সহযোগিতায় শিল্প, কৃষি এবং কৃষিসহায়ক অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজকর্মের প্রসার ঘটিয়ে ফুলিয়ার ভবিষ্যত উন্নতির মজবুত সোপান নির্মাণ করা যায়।

ফুলিয়া উপনগরীর পুনর্বাসন

মণীন্দ্রনাথ মজুমদার

১৯৪৬ সালের প্রথমার্ধে আমার অগ্রজ ৮কুলদা প্রসাদ মজুমদার আমাদের পাবনা জেলার অন্তর্গত ঈশ্বরদী থানার অধীন আওতা পাড়া-গ্রাম ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত এই বুঁইচা গ্রামে আরও তিনটি আত্মীয় পরিবারসহ নামমাত্র মূল্যে রায়তী স্থিতিবাস ৩৩ একর জমিকে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

১৯৭৭-৭৯ সালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহুলোক আসিয়া বুঁইচা মৌজার জমি খরিদ করিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎকালে অধুনা ফুলিয়া উপনগরীভূক্ত এলাকাসহ তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার জমিসমূহ জঙ্গলাকীর্ণ জনমানব শূন্য লোকাভাবে অনাবাদী পতিত জমি ছিল। আমরা ঐ সমস্ত জমির মধ্য হইতে নিজ নিজ সাধ্যমত জমি খরিদ করিয়া চাষ আবাদ এবং বসবাসের চেষ্টা আরম্ভ করি। কিন্তু ঐ সমস্ত এলাকা জনশূন্য, বাজার হাট ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্মান সম্মতিদের শিক্ষাদীক্ষার কোন সুযোগ ছিলনা। উক্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে যদি কোন বিস্তীর্ণ এলাকার পতিত জমি থাকে তাহা সরকার হইতে অধিগ্রহণ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবেন।

এমত বিজ্ঞপ্তিতে আমরা শিক্ষা দীক্ষা সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উজ্জলতর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের আশায় আশাবিত্ত হইয়া বুঁইচা উদয়পুর বেলগড়িয়া মৌজায় পতিত জমিসহ মায় আমাদের খরিদ স্বত্ব দখলীয় জমিসহ ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) বিঘা পতিত জমির একটি ম্যাপ প্রস্তুতে তৎকালীন মাননীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—৬৬

সাহিত্য সৈকত

সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট গন দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা জানাই। প্রাথমিক জ্ঞান হইয়াছিল যে ম্যাপের প্রদর্শিত পতিত জমিসমূহ অধিগ্রহণ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আমাদিগকে শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতিবান ও আর্থিক উন্নততর জীবনে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যবস্থা করিয়া উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন করিতে আজ্ঞা হয়।

জানা যায় যে মোট ৫০০০ বিঘা পতিত জমি প্রদর্শিত হইলে উক্ত বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে। এমত অবগত হইয়া আমরা আমাদের খরিদা ঐ এলাকার প্রায় সমস্ত জমি ম্যাপে পূর্ব প্রকাশিত জমি বাদে আরও ১৫০০ বিঘা জমির দ্বিতীয় একশত ম্যাপ উক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশমত পাঠাই। উক্ত আবেদন ও ৫০০০ হাজার বিঘার ম্যাপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উক্ত ৫০০০ বিঘা পতিত জমির ম্যাপ ও আবেদন পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় সরকারের Development Technical Adviser Commissioner (মাননীয় এস. কে. দে) বাহাদুর এই এলাকায় আসিয়া সমস্ত জমি পরিদর্শন অস্ত্রে এই এলাকার পুনর্বাসনকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

উক্ত পুনর্বাসন বিষয়ে আলোচনায় স্থিরকৃত হইয়াছিল যে উক্ত ফুলিয়া উপনগরীতে Plan estimate মত প্রথমে Camp refugee দের পুনর্বাসন সমাধা অস্ত্রে যে সমস্ত জমি পতিত উদ্ধৃত থাকিবে উক্ত জমি সমূহ যে সমস্ত পরিবার স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন বাবদ অধিগ্রহণের প্রার্থনা করিয়া পুনর্বাসন পাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিলি বর্টনে তাহাদিগকে উপনগরী এলাকায় শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতিবান ও অর্থনৈতিক উন্নততর পরিচ্ছন্ন জীবন গঠনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

উপরোক্তরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের Development Tech. Adviser বাহাদুরের আশ্বাসবাক্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনে Acquisition কালীন কোনরূপ আপত্তি করা হয় নাই। উপরন্তু

উপনগরীর গঠন কার্যে নানাভাবে স্বৈচ্ছাশ্রমদানে সাহায্য
সহযোগিতা করা হইয়াছিল।

যাহারা ফুলিয়ায় পুনর্বাসন পাইবার আশায় নিজ নিজ
স্বত্বাধিকারের জমি বিশ্বাসে সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন
তাহারা কি বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইয়াছে? তাহারা কি
পাইয়াছে ঐ সব নিজ নিজ জমিতে খেটে খাবার অধিকার? তাহারা
কি পাইয়াছে ছাত্র পাওনা পাবার অধিকার? পৃথিবীর ইতিহাসে
Rehabilitation বিষয়ে এত বড় বঞ্চনা বোধ হয় কোথাও নাই।

সত্যি, শুধু যাহারা এই এলাকার জমি কিনিয়া বসতি স্থাপনে
আগ্রহী ছিল, আবেদন করিয়াছিল পুনর্বাসন পাবার চরম বাঞ্ছনায়
তাহারা আজ বুকু গৃহহীন সর্বহারার দলে। এই সব লোক
কি পরিমান জমি দিয়াছিল নজর দিলে আন্তরিক সহানুভূতিশীল
মানুষ বোধ হয় তাহাদের চোখের জল রোধ করিতে পারিবেন
কিনা সন্দেহ।



স্বর্ণ শিল্পী

এস, এন, জুয়েলার্স

নির্ভরযোগ্য আধুনিক অলঙ্কার শিল্পী

টাদি রূপার গহনা বিক্রেতা

পরিচালক :—নিত্যানন্দ কল্মষকার।



ফুলিয়া রেলবাজার, বদীয়া, পিন ৭৪১৪০২

★ সততাই আমাদের মূলধন ★

বিঃদ্রঃ—শ্রুতি-সোমবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে।

ফুলিয়ার শিল্প ও শিল্প শিক্ষালয়

শিশির কুমার সিংহ

ফুলিয়া কলোনির জন্ম ১৯৫০ সনের যে মাসে আর আমি কাজে যোগদান করি ১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে। ফুলিয়া কলোনির সমস্ত হিসাবনিকাশের কাজ চারভাগে বিভক্ত ছিল ১) Administration ২) Constrvction ৩) Polytechnic ও ৪) Industry। এর মধ্যে তখন Industry বিভাগের হিসাব নিকাশ দেখার ক্ষমতা কোনো Accountant ছিল না। আমাকে Industry বিভাগের হিসাব-নিকাশ দেখার ভার দিলেন Accounts officer রাও-সাহেব। তখনই সজে লক্ষ্য করি যে এই এক বৎসরের মধ্যেই বেশীর ভাগ Industry বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। Weavers Coopera-tive-এর সদস্য ছিল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু যিনি এর সেক্রেটারী ছিলেন তিনি একজন যোগ্যব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কোনো অস্বাভাবিক কারণে আমি আসার পূর্বেই ফুলিয়া ছেড়ে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। পরে আমি এসে যাকে সেক্রেটারীর কাজ করতে দেখি - জীনরেশচন্দ্র - বসাক - তিনি - সাধ্যমত কো-অপারেটিভটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও সফল হননি সভ্যদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে। একটি Readymade garments Factory একটি Soap Industry ও একটি Hosiery Industry খোলা হয়েছিলো। সেগুলিও আমি এসে বন্ধ দেখতে পাই। Sheetmetal Industry, যেখানে প্রধানতঃ টিনের বালতি তৈরী হত, সেখানে কিছু কর্মী কাজ করত। কিন্তু আমি যখন আসি তখন তার মালিকানা সরকারের হাত থেকে চলে গিয়েছিল একজন কলকাতার ব্যবসায়ীর হাতে। সরকার শুধু সরকারি নির্দিষ্ট দরে তাদের লোহার চাদর যোগান দিত। সেখানে, - যতদূর মনে পড়ে, ১৫/২০ জন কর্মী কাজ করত এবং দিন দিন এরশ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে এর মালিক বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে কারবার বন্ধ করে চলে যান। মিলিটারি থেকে অবসরপ্রাপ্ত এফজেন উদ্বাস্ত ট্রাক ড্রাইভারকে টি. পি. মজুমদার পুরাতন একটি ট্রাক দেওয়া হয়েছিলো, সরকার ও ব্যবসায়ীদের মালপত্র বহন করে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে। শ্রীমজুমদার মাঝে মাঝে ট্রাকের দাম পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত টাকা জমা দিয়ে যেতেন এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত টাকা পরিশোধ করে এই পরিকল্পনার একটি নিদর্শন সার্থক রেখে গেছেন।

চাষীদেরকে বীজ, সার, হাল বলদ ইত্যাদির জন্তু ঋণ দেওয়া হয়েছিলো। সে ঋণ পরিশোধের জন্তু জমার ঘরে কিছু জমা পড়েছিলো বলে মনে পড়ে না। বরং তাদের হিসাবে খরচের ঘরেই আরও কিছু অঙ্ক বসাতে হয়েছিলো বলে মনে হয়।

Industry বিভাগের হিসাবনিকাসের খাতাগুলি আমি আমার সহকারী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীশ্রিয়মাধব চাকির সহযোগিতায় সম্পন্ন করি। সেই সময়ে ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে আমাকে ফুলিয়া পলিটেকনিকের Senior Clerk-Cum-Accountant পদে বদলী করা হয়। ঐ সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ফুলিয়া পলিটেকনিকের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের হাতে স্থানান্তরিত করেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে ফুলিয়া পলিটেকনিক, শিবপুর পলিটেকনিক (শিবপুর বি, ই, কলেজের অধীনস্থ) ও আসানসোল পলিটেকনিক এই তিনটি সরকারি পরিচালনাধীন পলিটেকনিকে এক বৎসরের ট্রেডকোর্স চালু ছিল। আমাদের পলিটেকনিকে চৌদ্দটি ট্রেড বা বিষয়ে প্রতি বৎসর ২০০ জন ছেলেকে ট্রেনিং দেওয়া হত। তাদের বয়স ১৮ বৎসরের মধ্যে হওয়া দরকার ছিল এবং পড়াশুনা অন্ততঃ Class VIII (অষ্টম শ্রেণী)-এর কম হলে চলত না। ট্রেনিং-এর বিষয়গুলি ছিল : ১) ফিটিং-৩২ জন, ২) ইলেকট্রিক— ১৬ জন, ৩) ওয়েল্ডিং ৮ জন, ৪) শিটমেটাল -৮ জন, ৫) প্রিটিং ও বুকবাইন্ডিং—৮ জন, ৬) কমার্শিয়াল আর্ট—১৬ জন ৭) উইল্ডিং বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া- ৭০

সাহিত্য সৈকত

৮ জন, ৮) টেলারিং—১৬ জন, ৯) লেদার ওয়ার্কস্—৮ জন, ১০) কার্পেট—১৬ জন, ১১) ব্যাকস্মিথি—৮ জন, ১২) ফাউণ্ড্রি—১৬ জন, ১৩) ম্যাশিনরী (রাজমিস্ত্রির কাজ) ৮ জন ও ১৪) হোমক্রাফ্ট (টেলারিং ও নিটিং) ৩২ জন (শুধু মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত)।

ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত উদ্বাস্তু প্রমাণপত্র থাকলে তাদের প্রত্যেককে ত্রিশ টাকা হিসাবে মাসিক ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হত। অল্প কিছু স্থানীয় (যারা উদ্বাস্তু নয়) ছেলেকেও ভর্তি করা হত। কিন্তু তাদের ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হত না, উপরন্তু ছয় টাকা মাসিক বেতন নেওয়া হত। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীরা ৩০ টাকা ষ্টাইপেন্ডের আকর্ষণেই ভর্তি হত, কাজ শেষার দিকে খুব অল্পছাত্রেরই মনোযোগ ছিল। ফলে, এখান থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ ছেলেই বেকারদের দল ভারী করত ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যেই বার্থ হত। যে অল্পসংখ্য ছাত্র মন দিয়ে কাজ শিখত, তারা হয় কোন কারখানায় কাজ পেয়ে যেত, না হয় নিজেরাই ছোটখাট কারখানা তৈরী করত তাতে সরকারী সাহায্যও পেত। যারা বেশ ভালভাবে কাজ শিখতে পারত তাদের অনেকে কর্মজীবনে প্রবেশ করে ১০০০/১৫০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করছে বলে জানি। বিশেষ করে একজনের কথা উল্লেখযোগ্য সে আমাদের তৎকালীন কমার্শিয়াল আর্ট ক্লাশের শিক্ষক খ্রীস্টদীনগুপ্তের ভাই সে এখন বোম্বাই নগরীতে একটি ক্যান্টরীর জেনারাল ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত উপার্জন ৩০০০ টাকার ও বেশী।

এখানে খ্রীদে-র একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার কথা পাঠকদের জানাতে চাই। সেটা হল শিক্ষিত চাষী তৈরী করার স্বপ্ন এখানে কলোনির অদূরে একটি Agriculture Farm স্থাপন করা হয়েছিলো। কিন্তু বাঙালির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বোধ হয় সব ছেলেই হয় চাকরি না হয় ব্যবসাতে নিযুক্ত হয়ে গেল; আর জমিগুলি অল্প চাষীদের চাষ করতে দিল আবার কেউ কেউ বিক্রীও করে দিল। খ্রীদের শিক্ষিত চাষী গড়ার কল্পনা কল্পনাই রয়ে গেল।

আমার শিল্প জীবনের তীর্থক্ষেত্র

পাঁচুগোপাল দত্ত

১৯৪৭ এর মাতৃহার। খণ্ডিত বাংলার নাগরিক ও বাস্তুহাবার স্বীকৃতি লাভের পর ১লা আগষ্ট ১৯৫৭ থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৬৮—একবৎসর মেয়াদী শিক্ষাক্রমে ফুলিয়া পলিটেকনিকের বাণিজ্যকলা বিভাগে স্থান পেলাম। তাই ফুলিয়া আমার শিল্পজীবনের তীর্থক্ষেত্র। এখানে আসার পর পেয়েছিলাম সুস্থ পরিবেশ, পথচলার নির্দেশ ও আনন্দ। এই বিভাগে শিক্ষকরূপে পেয়েছিলাম শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত ও শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে। জানি না কেন, কাদের আশ্রয় চেষ্টায় ও স্বার্থে এই কলা বিভাগ চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রবেশ দ্বারের সন্মুখে শিল্পী শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত মহাশয়ের সৃষ্টি “কর্মই জীবন” মূর্তিটি ছাত্রদের প্রেরণার উৎস হয়ে শিক্ষায় শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

হিন্মূল জীবনে সুখ-তৃপ্তির মানসিক দোলায় ফুলিয়ার এই সুন্দর পরিবেশ তৃপ্তকে ভুলিয়ে সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্যে মনকে সর্বদা আনন্দে ভরিয়ে রাখত। তাই দিন ও সময়ের হিসাবে যতই স্বল্প হোক না কেন ফুলিয়ার স্মৃতি আমার সারা জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। এই শিক্ষাক্ষেত্রে বাদ দিলেও যা আমার কাছে চিরস্মরণীয় তা হল ফুলিয়ার সাধারণ মানুষের ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি। সেজ্ঞা ফুলিয়ার সাধারণ মানুষের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ফুলিয়ার গ্রামীণ কৃষি শিক্ষাক্ষেত্রের সেই বিশাল খেড়ে ছাওয়া মাটির ঘরটি যা বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে আমাদের মনকে টেনে নিয়ে যেত; শিক্ষক মহাশয় সুধীনবাবুর নির্দেশে আমরা চারজন ছাত্রবন্ধু তার ভিতরের চার দেওয়ালে চারটি ছবি এঁকেছিলাম। কাজ করে এত আনন্দ পেয়েছিলাম তা কোনদিন ভোলার নয়। জানি না আজও তা অক্ষত আছে কিনা।

ফুলিয়ার মানুষ, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যে আত্মিক
যোগ ঘটেছিল তার মূলে ছিলেন সর্বহারাদের সাথী ও মনের মানুষ
মাষ্টারমশাই শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘হরিদাস ঠাকুর ও কবি কুস্তিবাসের জন্মস্থান’ স্মৃতি বিজড়িত
সেই ফুলিয়া গ্রাম স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতি মনকে আকৃষ্ট
করে ও অক্লান্ত ভরিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে কবির
অমর কীর্তি কুস্তিবাসী রামায়ণের কথা যা আজও বাঙালীর ঘর ও
মনকে আলোকিত করে রেখেছে। জন্মস্থানী সীতার দুঃখে
বাঙালীর নয়নধারা আজও অবিশ্রান্ত। আরও মনে পড়ে সেই
নিম কাঠের বিগ্রহ ‘গৌর-নিতাই’ জানি না কেন প্রথম দর্শনেই
আমার মনকে ভরিয়ে তুলেছিল। সেই স্মৃতি আজও আমার
মনকে নাড়া দেয়। কি যেন একটা অমুস্মৃতি মনে জেগেছিল,
যেন বলেছিল ‘ভয় নেই আমি আছি’ এ স্মৃতি কি কখনও ভোলা
যায়—এ যে লেখা ও বলার বাইরে। কীর্তিনিয়ার সুরে সুর
মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় নদীয়ার এ মাটি ও ধূলিকণা—

‘সে যে ধূলা নয় ধূলি নয়

গৌরের পদরেণু’

এই সুর ও স্মৃতি পুণ্য সলিলা গঙ্গার স্রোতের টানে মনকে তাসিয়ে
নিয়ে যাচ্ছে দূরে—বহুদূরে কোথায় তা কে জানে।

With the best Compliments from :—

Dial : 714

Amarendra Nath Biswas

TRANSPORTER, GOVT. CONTRACTOR &
GENERAL ORDER SUPPLIER,

Bamandas Mukherjee Lane
P.O. Krishnagar, Dist. Nadia.

জীবনে যদি শত্রু কোন প্রক্ষেপণ থাকে — (৩০ পৃষ্ঠার পর)
মজার মজার কতকগুলো ঘটনা।

তারপর আমাকে, অর্জুণ সাজালেন একবার। অমূল্য চক্রবর্তী বলে টেলিগ্রাফ এক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কর্ণ সেজেছিলেন। একটা দৃশ্য আছেনা স্রোপদীকে পাণ্ডয়ার ক্ষত তীর ছুঁতে হবে। কারদা করে তীরটা আর ছুঁতে পারি না— কিছুতেই ছুঁতে পারলাম না। অমূল্যবাবু বললেন আমার সমস্ত action-এই রামানন্দবাবু নষ্ট করে দিয়েছেন।

আর একটা জিনিষ শুরু করেছিলাম ওখানকার ছেলেদের ভিতরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া, আবৃত্তি করা। প্রায় ৫০/৬০ জন ছেলে নিয়ে আমরা একসঙ্গে গেয়েছি।

এখন কী হয় জানি না। আমি দেখতাম ফুলিয়া পলিটেকনিক থেকে পাশ করে কম ছেলে বসে থাকছে।

আমি হষ্টেলে খেতাম ছেলেদের সঙ্গে। খুব ধনী বাড়ীর ছেলে নই আমি। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মধ্যবিত্ত বললে ঠিক বলা হয় না, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ীর ছেলে। কিন্তু একটা ঐশ্বর্য পেয়েছিলাম-পয়সা নেই বোধ ছিল না। মা-বাবা এই একটা জিনিষ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যে দরিদ্র বোধ ছিল না। যেমন রিক্সাওয়ালার দরিদ্রবোধ থাকে না, একটা মোটর দরিদ্র বোধ থাকে না দরিদ্র বোধ থাকে যারা উপায় করে বেশী করতে পারে না তাদের। দরিদ্র বোধটা বড় নয়। এখন যেমন মনে হয় এহটা সময়ে শশা দিয়ে ভাত খেয়েছি—কম খেয়েছি। যখন খেতাম তখন কখনও মনে হতো না, কেন শশা দিয়ে খাচ্ছি মাংস দিয়ে খাচ্ছি না।

আমার বাবা রেল খুব সামান্য চাকরী করতেন। পঁচাত্তর টাকা মাইনে পেতেন। কিন্তু অত্যন্ত সংলোক ছিলেন। সং বলতে যা বোঝায়। ঈশ্বরামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত ছিলেন, অভৈদানন্দ দীক্ষিত ছিলেন। সিউড়ির কাছে বন পারুলিয়া গ্রামে আমার জন্ম। বীরভূম আমার জন্মভিটে।

আমিই বাড়ীর বড় ছেলে বড় ছেলে অটিষ্ট হচ্ছে মা-বাবার তো উৎসাহের শেষ নেই।

বাবা একবার লিখলেন—আমি চাই তোমাকে বেঁচে থাকার জন্তে যদি পানের দোকানও করতে হয় তা ও ভাল কিন্তু ছবি আঁকছো এটা যেন মৃত্যুর সময়ে জেনে যেতে চাই। তাই আমি ফুলিয়ার আড়াইশ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে একশ' কুড়ি টাকা মাইনের চাকরীতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাই। আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমি যেন রামকৃষ্ণ মিশনে কাজ করি।

ফুলিয়ার চাকরীটা আমার মনোবৃত্তির সহায়ক হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে মেশার স্তরটা আমার কোন অনুবিধা হতো না। বুঝতে পারতাম কত দুঃস্থ, কী কষ্টে ছেলেরা আসতো। ওখান থেকে যখন চলে এলাম তখনও বহু ছেলের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রেখেছি। আমি ফুলিয়ায় থেকে আগরপাড়ায় একটা জায়গা করেছিলাম যাতে ছেলেরা একসঙ্গে Art College-এ আসতে পারে। ১৫ দিন অন্তর সেখানে আসতাম। একসঙ্গে রান্না করতাম, টাকা দিয়ে যেতাম।

ফুলিয়া থেকে ২/১ টা স্টেশন আগে শৈলেন বলে একটি ছেলে ছিল। অসম্ভব কষ্ট করেছিল। যার পুলিশে চাকরীর জন্তে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সে যায়নি। আর্ট লাইনেই থেকে গেলো। এখন বাড়ী করেছে, প্রেস করেছে, গরু করেছে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসে।

আমি একদিন exhibition করছি কোলকাতায় শৈলেন এসে হাজির।

—মাষ্টারমশাই, আপনার জন্তে একটা জিনিস এনেছি আপনাকে খেতে হবে।

আমি বললাম বলো, এখন খেতে পারবো! ও বললো খেতে পারবেন। ফ্লাক্সে দু'কাপ দুধ নিয়ে এসেছে। বলছে, আমার গরু নতুন বাচ্চা দিয়েছে তাই দুধটা আপনার জন্তে নিয়ে এসেছি।

এগুলো আর কিছু নয়,—ভাল লাগে। কেউ তরকারী বেঁধে নিয়ে এলো। খেজুর গুড় কেউ নিয়ে এলো। কালী বলে একটি ছেলে জয়নগর থেকে বিরাট কাঁঠাল নিয়ে এলো। ও এলেই আমি জিজ্ঞেস করি কই তুমি বাতাসা আনলে না!

আমার কী বাতাসার প্রয়োজন আছে। তা নয়। কিন্তু ও খুশী হয় নিয়ে এলে। এখনও আমার বাড়ীতে অব্যবস্থা আছে। বাড়ীতে এলে শুতে পায়। অভাব হলে লেখে মাষ্টারমশাই টাকা পাঠান। হয়েছে কী, সংসারের মতন করে ফেলতে না পারলে শিক্ষকতা করা উচিত নয়। আমার তো মনে হয় জীবনে যদি সবচেয়ে শক্ত কোন Profession থাকে সেটা হলো শিক্ষকতা। কেন জানেন, আমি তো মানুষ। আমারও অল্লীল ছবি দেখতে ইচ্ছে করে, অল্লীল বই পড়তে ইচ্ছে করে। আমি যে প্রফেশন নিয়েছি তা' allow করেনা এটা। এই সংঘম পালন করতে হবে। যেমন সম্ভাবনার সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না, সে রকম শিক্ষকেরও ছাত্রদের সামনে কিছু কিছু জিনিস করা যায় না। আমি ইচ্ছা করলেই যা ইচ্ছা তাই পোষাক করতে পারি না—আমায় allow করেনা।

আমি তো ছাত্রদের দোষ দিইনা। কখনো দিই না।

ধরুন শিক্ষকতা আমরা করি। আমাদের সততা কোথায় ? —আমি যে পারি না। আপনি তো বাবা পারেন কতকগুলো জিনিস করতে! কিন্তু শিক্ষক হয়ে আমি পারছি। Genuine শিক্ষক হতে কেউ আসিনি আমরা। ছাত্র পাশ করে বেরিয়ে গেলে সম্পর্ক থাকেনা। কেন থাকবে না। আমরা একজন ছাত্রকেও বলি ভাত খেয়ে যাও। কিন্তু আমার ভোটের জন্তে খাটো একথা বলি। সেই জন্তে ছাত্রেরাও বলে আপনার ভোটের জন্তে খেটেছিলাম—কেন পারসেনটেজ দেবেন না।

আমরা পিতা হতে পারিনা, আমরা মা হতে পারিনা, দাদা হতে পারিনা, শিক্ষক হই কী সে! শিক্ষক তো পরিপূরক মাতা-পিতার। বন্ধু তো, সখা।

ছেলেদেরকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে আমি নিঃস্বার্থ। যে কোন ছেলেকে বুঝিয়ে দিলে সে ছাত্র বুঝবেই। পৃথিবীতে এমন কোন ছাত্র নেই নিঃস্বার্থ শিক্ষককে সে শ্রদ্ধা করেনি। আমাকে একটা ছাত্র পৃথিবী থেকে বার করে দিতে পারবে না যে সত্যি ছাত্র নিঃস্বার্থ শিক্ষককে যথার্থ সম্মান দেয়নি।

আমাকে অনেকে বলেন—আপনার যুগ যন্ত্রণা নেই, দুঃখের ছবি আঁকেন না।

—গরীবরা তো জন্মেছে আর্টিষ্টদের ছবি আঁকার জন্তে, কবির কবিতা লেখার জন্তে, ক্রিটিকদের ক্রিটিসিজমের জন্তে, ফটোগ্রাফারদের ফটো তোলার জন্তে রাজনীতির সঙ্গে যাবার জন্তে ফিল্ম মেকারদের ফিল্ম করার জন্তে—এই সমাজটাকে আমরা সবাই মিলে চাইছি বাঁচিয়ে রাখতে। প্রত্যেকে চাইছি প্রত্যেকে। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটি লোক রাশিয়ানদের মতো মোটা হতে পারি। প্রত্যেকটি লোক দৌড়লে রাশিয়ানদের মত কান লাগ, গাল লাগ হতে পারে আমরা চাইনা কেউ চায়না।

আমি তো পুরুলিয়ায় ছিলাম। কী গরম! মাটি ফেটে গেছে, কী কষ্টে লোকে চাষ করলো। ধান কাটলো ধান মাড়াই করলো। কী হলো জ্ঞানেন, ট্রাকে করে সেই ধান চলে গেলো। লঙ্করখানা খোলা হলো। যারা ধান তৈরী করেছিল ফুটো এলোমিনিয়ামের থালা নিয়ে দাঁড়ালো। সেবা সম্বন্ধে খিচুড়ী রান্না করে তাদের দিলো।—নাম হলো সেবাসম্বন্ধের। এই exploitation এর কোন মূল্য আছে? যারা করেছিল তারাই লাইন বেঁধে নিচ্ছে কিন্তু কেশের নাম হচ্ছে। কীসের কী?

আমি তো মনে করি স্বাধীনতা সেই দিন হবে যে দিন কোন দল এসে বলতে পারবেনা তোমাদের জন্তে আমরা এই করেছি, ওরা যেদিন বলতে পারবে আমাদের জন্তে আমরা করে নেবো সেই দিনই জানতে হবে সত্যি সত্যি স্বাধীনতা এসেছে। সেই দিন দেখবেন মনীষীরা যে ভারতবর্ষ একদিন গড়েছিলেন সেই ভারতবর্ষ আমরা দেখবো। আসলে এটা আমরা হতে দিতে চাইনা।

আমাদের কী অধিকার আছে বলুনতো বলি—তোমাদের জন্তে ব্রীজ করে দিলাম—কার পয়সায় তুমি ব্রীজ করে দিয়েছো? তোমাদের জন্তে স্কুল করে দিলাম—কার জন্তে স্কুল করেছো। বিরাট ব্যাবসায় করলে,—একজন সাঁওতালকে দিয়ে Open করলে এর থেকে মকরী আর নেই। কেন সাঁওতালকে দিয়ে Open করলে, কী প্রয়োজন? কোন সম্পর্কই নেই তো তার সাহিত্য সৈকত

এ বিষয়ে। ও তো মাটি কেটেছে তোমরা খুশী হচ্ছে।

আমাদের ছবি আঁকতে হবে রক্ত পড়বে, হার জিরন্তিরে কঙ্কাল বার করা তবে আমি জনতার লোক। আমি কেন আঁকবো ওই ছবি তোমাদের তৈরী করা মানুষ গুলোকে পটে আঁকতে হবে? আমার কী কোন দুঃখ নেই! দুঃখ আছে, বেদনা আছে কিন্তু আমি কিছুতেই প্রতিষ্ঠা দেবোনা। এটা তোমাদের তৈরী করা।

আপনি তো গ্রামের দিকে থাকেন—আমাকে একটা দেখিয়ে দিন তো যে গরীব, ভিক্ষে করছে এমন গরীব এখনো ছবি আঁকছে কীনা! একটা পাবেন না। —নিজেরা ভিক্ষে চাইতে বঙ্কালের মত পড়ে আছে একটা ছবি বার করে দিন! —তাদেরইতো কষ্ট তাহলে তারা আঁকছে না কেন? যত বোঝা আমরা ওদের ছবি আঁকার জন্তে। আর তাদের মত সম সাময়িক আমরা আঁকতে পেরেছি?

আপনি কবিতা নিয়ে দেখুন, পৌঁছুতে পারলেন হলো, না পৌঁছুতে পারলেন তো শত পদ্যকূল হাতে থাক হলোনা। কিন্তু যে পিন গুঁজে গুঁজে পদ্য তৈরী করে নিয়ে গেছে পৌঁছে যায় তো হয়ে গেলো।

আমার যেটা মনে হয় জীবনে সত্যতা থাকলে, সত্যতা তো পরের জন্তে নয়, সত্য কথা বলটা পরের জন্তে নয় নিজের জন্তে —আমার শির দাঁড়া সোজা থাকবে—এইটা আমি মনে করি।

লোকটা সত্যবাদী বললে তো কিছু হবেনা আমি সত্যবাদী কীনা এটা একান্তই আমার প্রশ্ন। তবে সমাজের একটু উপকার হয় সত্য কথা বললে।

আর্টিষ্টরা বা কবিরা ভুলে যান যে সমাজেও তাদের কিছু কর্তব্য আছে। সমাজেও তাদের কিছু দিচ্ছে। অনেক মনীষী স্তর থেকে নেমে এসে সমাজের জন্তেও কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও সমাজের মানুষের জন্তেই লিখেছেন। একজন মানুষ দুঃখের জন্তে যদি সাধুর কাছে ছুটতে পারে একজন শিল্পীর কাছে, কবির কাছে

কেন ছুটবেনা সেই বীজ কেন তৈরী হবেনা। একজন কবি বা একজন শিল্পী মানুষের মধ্যে কেন সতীর্থ হতে পারবেনা? আমরা পারিনা।

অনেক কবি শিল্পী দেখবেন বলে—ছবি দেখে বুঝে নাও। কেন বুঝে নেবে? তুমি টাঙ্গিয়েছো বুঝে নেবে কেন?

তোমায় বলতে হবে। তোমার দায়িত্ব সাধারণ লোককে বোঝানো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অ, আ, ক, খ শেখানোও যেমন এটাও তেমন। বলে দিলে তো হবে না কেন মানবে লোকে?

একজন genuine শিল্পীকে বোঝা যায় যিনি ছবি আঁকেন তিনিও যেমনি তাঁর ছবি দেখে বুঝতে পারেন যিনি ছবি আঁকেন না তিনিও এর থেকে রস পাচ্ছেন। তিনি অসাধারণেরও তিনি জনসাধারণেরও। সত্যি কবিতা সত্যি সাহিত্য সত্যি গান যেমনি অসাধারণেরও তেমনি জন সাধারণেরও।

Generic টিকবে না। একহাত ডুবে মুক্তো পাওয়া যায় না। অনেক বেশী ডুবতে হয় মুক্তো পাওয়ার ক্ষেত্রে।

আপনার কী মনে হয়? এতদিন তো আছেন।

ভেঙ্গে পড়ারও কিছু নেই। চেষ্টা করি ভেঙ্গে না পড়তে। অনেক সময় পারি না। মানুষতো! Negative টাকে সব সময় সঙ্গে রাখি। Positive হলে আনন্দ হয় মন তো নানান ভাবে বিব্রত হয় টুকরো কথাতেও। আপনি নিজে কবিতা লেখেন আমাদের মন বোধ হয় একটু বেশী সন্তুষ্ট। একটু যা খেলেই বেশী বাজে।

এইভাবে আমি ভাবি জানেন।

ফুলিয়া কলোনির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা দিলীপ কুমার দাশগুপ্ত

সৈয়রা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন তখন রণবাঞ্ছের রেওয়াজ আছে যা তাদের ক্লান্তি, অবসাদ দূর করে মনেপ্রাণে আনে নতুন শ্রেরণা ও উৎসাহ। ফুলিয়া কলোনিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চেউ তুলেছিল জীবনের। সেই তরঙ্গে ছিল বেঁচে থাকার আনন্দ। বহুখ্যাত ও অখ্যাত শিল্পী সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল ফুলিয়া কলোনির সাংস্কৃতিক সংস্থা। যার পুরোভাগে ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রস গীত-শিল্পী প্রয়াত ইন্দুলেখা ঘোষ ও খ্যাতনামা গণশিল্পী জীসাধন দাশগুপ্ত, এক সময় ছিল যখন সংগীত, নাটক, কীর্তন ও যাত্রাভিনয় ফুলিয়াকে মাতিয়ে রাখত। কীর্তনে প্রয়াত হুরেন রায়, জীঅতুল শীল, রামায়ণ গানে জীক্ষিরোদ দত্ত যেমন একদিকে তাদের স্মৃতিষ্ঠ কণ্ঠে ফুলিয়ার শ্রোতাদের ভারসাগরে ডুবিয়ে রাখত, অত্রদিকে প্রয়াত ক্ষিতীশ মুখার্জী (তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান), তারাপদ মজুমদার, সর্বজী কিশোরী সাহা, দ্বিজেন রায়, ননীদাস, নেপাল দেবনাথ, অতুল শীল বিভিন্ন যাত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুলিয়াকে করে রাখত সরগরম। প্রয়াত হরিশ গোস্বামী ও নরেন চক্রবর্তী বাঁশীরত্নে ফুলিয়ার আবহাওয়াকে করে রাখত মাতোয়ারা। ছোটখাট অনুষ্ঠানও জনহিতকর কাজের মাধ্যমে ফুলিয়ার বহুশিল্পী ফুলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনকে করে তুলেছিল মুগ্ধ ও ফুলিয়ার জনজীবনের সাংস্কৃতিক ঐক্যের সীমানাকে বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ফুলিয়া তখন একটি পরিবারেরই রূপ নিয়েছিল। ফুলিয়া গ্রাম, বয়রা, বুঁইচা, প্রফুল্ল নগর প্রভৃতি গ্রামের জনজীবনের সাথে ফুলিয়া কলোনির উদ্বাস্তুদের তৈরী হয়েছিল সাংস্কৃতিক ঐক্যের সেতু। আর এই রাশীবন্ধনের গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন জীসাধন দাশগুপ্ত,

শ্রীগণেশ রায় ও প্রয়াত নরেশ চন্দ্র সোম। আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে প্রয়াত কালীপদ ভট্টাচার্য্য, কালীপদ ভৌমিক, রঞ্জন সরকার ও রাজেন্দ্রলাল ভৌমিকের কথা। তাঁদের অকুরন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা একটি সুস্থ ও সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে, সাংস্কৃতিক রাখীবন্ধনে নিপুনভাবে সাহায্য করেছিল। তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসেছিল একতা ও ভালবাসার নিখরিশী।

ফুলিয়া কলোনির সাংস্কৃতিক দল গিয়েছিল নীলোথেরিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ১৯৫১ সালে। সেই বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, লেডি মাউন্টব্যাটন শ্রী এস. কে. দে ও ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। পরিবেশনার উৎকর্ষতায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় উদ্ভাসিত করেছিল ফুলিয়া কলোনির সাংস্কৃতিক দলকে ॥ অনুষ্ঠান মুখর ছিল নৃত্যে, সংগীতে ও বাজে, সেই সাংস্কৃতিক দলের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু রেখে গেছেন মধুর স্মৃতি। তাঁদের আমরা ভুলবনা, তাঁদের সঙ্গী হিসাবে আমি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম বলেই তাঁদের ভুলতে পারিনা।

দিন এগুতে লাগল। ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠতে লাগল, শত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করে নতুন কিছু গড়বার আকাংক্ষা উদ্ভূত হয়ে কিছু যুবক এগিয়ে এল। তাদের উৎসাহ ও উত্তমে স্থাপিত হল মিলন সংঘ জাগরণী সংঘ, জওহর সংঘ, নেতাজী সংঘ, ষ্টোক রিক্রিয়েশান ক্লাব, শিল্পীতীর্থ। এইভাবে ফুলিয়া কলোনিতে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হল। এই সব প্রাণ-চঞ্চল যুবকদের অবদান নিঃসন্দেহে প্রাশংসার যোগ্য। সর্বশ্রী তুষার ঘোষ, নির্মল চ্যাটার্জী, বিহ্যাত সমাদ্দার ও তমাল ভট্টাচার্য্যের সুযোগ্য নেতৃত্বে শিল্পীতীর্থ কিছু কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ফুলিয়ার বাইরেও এই সংস্থার প্রযোজনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে কলোনির জনসাধারণের শ্রীতি ও স্তম্ভেচ্ছার একটা নতুন দিক প্রসারিত

করেছিল। আর তার সাথে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি সর্ব্বশ্রী মানস গোবিন্দ সেন, সমরভোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের অবদানকে। তাঁদের উদার মনোভাব, আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ভুলবার নয়। স্থাপিত হল ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্র ১৯৫৬ সালে তৎকালীন বি ডি ও প্রয়াত বৈষ্ণাথ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ডেভেলপমেন্ট কমিশনার মাননীয় হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলেন। জনরঞ্জন কেন্দ্রের প্রথম সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপরই ছিল। এর স্তূৰ্ণরূপ আমি দিতে পারিনি কারণ আমি বদলী হয়ে যাই। আমার পর অনেক গুণীবাক্তি এগিয়ে এসেছিলেন কেন্দ্রের উন্নতিকল্পে। কিন্তু যাদের প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে আজ, তাঁরা হচ্ছেন সর্ব্বশ্রী গণেশ রায় ও মোহন সরকার। রঙ্গমঞ্চ, গ্রামীণ পাঠাগার, রবীন্দ্র উদ্যান, বিজয়া মেলা তাঁদেরই আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টার ফসল। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে আজকের এই বিরাট কেন্দ্র কখনও গড়ে উঠতে পারতনা এই দুই কর্মী ব্যতিরেকে। প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যেমন গভীর অনুসন্ধানী ছিল, ছিল পরিশ্রম সাধ্যও। তাঁরা একাগ্রতার সাথে সেগুলি সম্পন্নও করেন। বাইরের বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের লোকরঞ্জন শাখা এই রঙ্গমঞ্চে বহু অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন আর তা সম্ভব হয়েছিল ঐ দুই কর্মীর যৌথ প্রচেষ্টায়।

ফুলিয়া কলোনির আজকের চেহারা ও আগেকার চেহারায় অনেক পার্থক্য। কোথায় যেন কিসের অভাব। সবাই পাশ কাটিয়ে যাবার ক্ষমতা বাস্তু। যারা ফুলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনকে এক উজ্জীবিত ভূমিকায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা জীবনের চড়াই ও উৎরাইয়ে ধমুকে দাড়িয়েছেন। এখনও বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা স্বকীয় ভঙ্গিতে ও নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন জানিনা কতটুকু সামাজিক দায়িত্ব বোধের পরিচয় ও সাংগঠনিক চেতনার প্রমাণ তারা দিতে পারছেন।

আনুগত্য, নিষ্ঠা ও সহনশীলতা ছাড়া কোন সংস্থাই গড়ে ওঠেনা। তবে, আশা ও ভরসার কথা নতুন নতুন শিল্পী শিক্ষাবিদ আজ ফুলিয়াতে পদার্পন করছেন ও ফুলিয়া কলোনিতেও নতুন শিল্পীর মুখ দেখতে পারছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এই সমস্ত নবীন শিল্পীরা বিভিন্ন পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব্বেকার সেই সৌন্দর্য্য ও সুস্থতা বেঁচে থাকার সেই নির্মল আনন্দ আর আবা থাকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করবেন।

ফুলিয়া উপনগরীর ইতিকথা

চারুচন্দ্র জোয়ারদার

১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গ থেকে (বর্তমান বাংলাদেশ) উদ্ধাস্ত আগমনের স্রোতে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কতক ত্রাণ শিবির ভর্তি হয়ে গেল। তাদেরকে শীত্রই ঘরবাড়ী দিয়ে, জমিজমা, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে ও বণ্টনে নিয়োজিত করে পুনর্বাসিত কোরবার একান্ত প্রয়োজন হলো।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সমস্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত কোলকাতা এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন ভারত গভর্নমেন্টের পুনর্বাসন বিভাগের Honorary উপদেষ্টা এস্. কে. দে মহাশয়কে। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে বিস্তৃত আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ কোরলেন।

ইতিপূর্বে ১৯৪৭ এর আগষ্ট মাসে পশ্চিম পাঞ্চাব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে পূর্বপাঞ্চাবে ‘কুরুক্ষেত্র’ ত্রাণ শিবিরে আসা উদ্ধাস্তদের নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে আরও বিস্তৃত পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে ‘কর্ণাল’ জেলায় ‘নিলোখেরীতে’ কাজ বেশ কিছুদূর ভালভাবে এগিয়ে চলেছিল এস্. কে. দে মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায়। ঐ পরিকল্পনার মৌলিক ধারা ও ধাচে পশ্চিমবঙ্গে Composite Township অর্থাৎ Rural-cum urban Township গড়ার বিস্তৃত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সমর্থিত হলো।

একটি Pilot Scheme কোরে প্রথমে পরীক্ষা নিরীক্ষায় এগিয়ে গেলে ভবিষ্যতে আরও ৯/১০টি এরূপ Township কোরে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব হলো।

এই Pilot Scheme এর খসড়া তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন কোরলেন। প্রথমে Pilot Scheme এর স্থান খুঁজে পছন্দ করার ভার এস্. কে. দে মহাশয়ের উপর অর্পিত হলো। উপনগরীর জন্ম জায়গা বিভিন্ন জেলায় খুঁজে খুঁজে ফুলিয়ায় অনেক

পতিত জমি এক জায়গায় পেয়ে সেখানে স্থান নির্ধারিত হলো। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা ছিল। সম্ভবতঃ পুরোনো তিনটি গ্রাম মৌজার অংশ নিয়ে এই স্থান নির্মিত হলো। পরিকল্পনার নাম দেওয়া হলো 'The Nadia Scheme। স্থানের নাম দেওয়া হলো 'ফুলিয়া উপনগরী'—এবং এর আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতীক 'নটরাজের মূর্তি'—জাতীয় সড়ক ৩৪ থেকে উপনগরীতে চৌকবার আগে বাঁদিকে বসান হলো এবং নীচে লেখা রইল 'মজতুর মঞ্জিল।'

ফুলিয়া উপনগরী যে পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হয়েছিলো তার মর্ম্য কথা এই—

- ১। মানুষের প্রত্যেকের বাঁচিবার অধিকার আছে।
- ২। মানুষের প্রত্যেকের শ্রমের অধিকার আছে।
- ৩। মানুষের প্রত্যেকের জ্ঞান্য পাওনা পাবার অধিকার আছে এবং এই বিশ্বাস মানুষের আছে যে মানুষ তা পারে।
- ৪। মানুষকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগালে তা সম্ভব।
- ৫। উপযুক্ত পরিপার্শ্ব তৈয়ার করলে মানুষই সব সম্ভব করতে পারে। পরিকল্পনার আরও স্পষ্ট রূপরেখা ছিল—
- ১। জ্ঞান্য মূল্যে বাড়ী, প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, বিভিন্নস্তরের সাধারণ বিদ্যালয়, চাষের জমি, খাদ্য শস্য ও সজ্জী প্রভৃতি উৎপাদনে সহায়তা, হাসপাতাল, তৈয়ার ও গো, মহিষ, মুরগী, হাঁস, ইত্যাদি পালনে যথাসম্ভব স্বয়ংস্বর কোরে তোলার চেষ্টা করা।
- ২। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে, হাতের কাজে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্য V. T. C.-Cum Polytechnic প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- ৩। মেয়েদের চাক ও কারু শিল্প অর্থাৎ হাতের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দান।
- ৪। সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য বাজার তৈয়ার।
- ৫। ছোট, বড় সকলের জন্য দৈহিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সুযোগদান।
- ৬। এই উপনগরী যথাসম্ভব উদ্বাস্তুগনই নিজস্বশ্রমে গড়ে তুলবেন। চাষ, বাগান ও আবাসিক গ্রামীণ শিল্পের উপর বেশী

দৃষ্টি রাখবে যাতে কোরে যথাসম্ভব নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবোয়
স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

৭৭ ফুলিয়া উপনগরী স্বয়ংশাসিত ও স্বয়ংস্বর হবে নিম্ন প্রতিষ্ঠান
গুলির মাধ্যমে—

ক) আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখবে পঞ্চায়েৎ খ) কেন্দ্রীয় সমবায়
সমিতি থাকবে উৎপাদকদের গ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি
থাকবে ক্রেতাসকলের। এই সব গঠিত হওয়ার উদ্দেশ্য—
আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যতদূর সম্ভব নিত্যপ্রয়োজনীয়
জিনিষ উৎপাদন, বর্টন ও অতিরিক্ত উৎপাদন বিনিময়ে
বাইরে থেকে অগ্রাগ্র প্রয়োজনীয় জিনিষের সংগ্রহে অভাব
দূরীকরণ।

৮৮ ফুলিয়া উপনগরীর জনসাধারণ কেহ কাহাকেও শোষণ করার
সুযোগ না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে পুনর্বাসতির কাজ
এগিয়ে দেবে। বিভিন্ন বৃত্তির একহাজার পরিবারের
উপনগরী তৈয়ারী হওয়ার পরিকল্পনায় এই ‘নদীয়া ফীম’।
এই পরিকল্পনার মুঞ্জুরী টাকার পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ।

ফুলিয়া উপনগরীর পুনর্বাসন পরিকল্পনা জীএস. কে. দে
রহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ থেকে ১৯৫০
সনের প্রথম দিকে শুরু হয়। যতটুকু মনে পড়ে, ফুলিয়ায় ৮৪৬
একরের মত পতিত জমি নিয়ে যে জায়গা পছন্দ করা হয়েছিল
সেটা ছিল ব্যাঘ্র ও সর্প সঙ্কুল, খাগড়া বন ঘোপ জঙ্গল ও কেশে
ঘাসে পরিপূর্ণ।

সবটুকু জায়গাকে তিনটি ব্লকে ভাগ করা হয়েছিল।

ক) কৃষি ও কৃষিজীবীদের ব্লক খ) মডেল কার্ম ও ভবনলোক
চাষীদের ব্লক গ) সহর ব্লক। সহর ব্লকের উদ্দেশ্য সহরের-স্বাভাবিক
অপিস, শিল্প শিক্ষালয়, ছোট বড় সাধারণ বিভাগালয়, হাসপাতাল,
শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজার ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৯৫০ সনের পূর্বেই যে সব উদ্বাস্তুগণ নিজেরাই বাস্তু করে
নিয়েছিলেন তাদের জমি যথা সম্ভব ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

এই সনের প্রথম ভাগে এই উপনগরীর দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন পি, গুহঠাকুরতা। ক্রমে ডি, টি দেশাই, বি ডি, নন্দা, গণেশন এলেন। প্রারম্ভে নিলোথেরি থেকে কিছু কর্মী এসে প্রাথমিক কাজ করে গেলেন। মনে হয় মে মাসের মধ্যেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সভাস্থরে উপনগরীর কথা ঘোষণা করা হলো।

প্রশাসনিক কাজ দ্রুত শুরু করার উদ্দেশ্যে কুলদা মজুমদার মহাশয়ের খামার বাড়ীর টিনের চালা ঘরে প্রথম অফিস শুরু হয়েছিল। ট্রাকটার দিয়ে কেশে ঘাসের গোড়া তুলতে হয়েছিল।

ফুলিয়া উপনগরীর সহরাক্সল রেল স্টেশনের কাছাকাছি হলেও সহরে পৌঁছবার কোন রাস্তা ছিলনা। ক্ষেতের আল দিয়ে যেতে হতো। বর্ষার সন্ধ্যায় জলন্ত মশাল হাতে পৌঁছিতে হতো। রেল স্টেশনটির নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রামা হাট ছিল এবং পানীয় জলের একটি হাত নলকূপ ছিল।

V. T. C. Cum Polytechnic প্রতিষ্ঠানের জন্ম যত্নপাতি ও অত্যান্ত সরঞ্জাম বেশ কিছু নিলোথেরী থেকে এলো। বাকী সব কলিকাতা থেকে। এ. এন. রায়, সুন্দর নারায়ণ ব্যানার্জী, জে, পি, মেহতা এবং আরো অনেকে এলেন কর্মী হিসাবে। মহিলা কর্মীকেন্দ্র খুলতে এলেন সুগায়িকা ইন্দুলেখা ঘোষ এবং স্মৃতি দাশগুপ্ত। মণিকা দত্ত এলেন মেয়েদের শরীর চর্চা এবং ব্রতচারী ইত্যাদি শেখাতে। Hony Instructor এলেন তড়িৎভূষণ রাউত। দিলীপ দাশগুপ্ত, সাধন দাশগুপ্ত অফিসের কাজ ছাড়াও সাংস্কৃতিক বিভাগের ভার নিলেন। অনুরোধ সেনগুপ্ত শিশির পত্রনবিশ 'ফুলিয়া' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিলেন। স্টেশনের কাছে একটি গুদাম ঘরকে শিল্প শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস তৈরী করা হলো। ছাত্রাবাসের দায়িত্বে এলেন নরেশ চন্দ্র সোম।

কৃষির ট্রেনিং কেন্দ্র তৈরিতে শুরু হলো। কৃষি বিভাগের দায়িত্বে এলেন প্রশান্ত শঙ্কর মজুমদার ও সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী।

জ্ঞান শিবির থেকে ক্রমে চাষী, তাঁতী, লৌহশিল্পী, কাঠ শিল্পী, মুংশিল্পী, বরজীবী, চাষী শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী ও বিভিন্ন শ্রমিক ও দোকানদারকে আনা হলো।

যতদূর মনে পড়ে চাষী ৫৯ পরিবার, তাঁত শিল্পী ১২৪ ভদ্রলোক যুব চাষী ৭৬, দক্ষিণ ২৭, মুংশিল্পী ১১ বরজীবী-৪ দোকানী ৩১, কাঠশিল্পী ১১ লৌহশিল্পী ৩০, বিবিধ শ্রমিক ২০ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ১৬৫ মত। কলকাতা থেকে Railway wagon এ মালপত্র আনার সুবিধার জন্য এস, কে, দে মহাশয়ের চেষ্টায় ১৪ দিনের ভেতর ফুলিয়া স্টেশনে Railway Siding এর ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

ফুলিয়ার কাজ যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত বেগে শুরু হলো। সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা ১টা পর্যন্ত। কোন কোন সময় সারারাত চলতো। বাড়ী ঘরের জন্তে নিলোথেরী কাঠের কারখানা থেকে তৈরী দরজা জানালা ইত্যাদি আনা হলো। কয়েকজন রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি এলো নিলোথেরী থেকে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেড, গেট হাউস তৈরী হলো। সহরে Ad-hoc Panchayat গঠিত হলো।

ভদ্রলোক চাষীদের জায়গা, যা পরবর্তী সময়ে সবুজ পল্লী নামে চালু হলো তাদেরকে ট্রেনিং শেষে সেচের জলসহ জমি, চাষের গাভী দেওয়া হলো।

ফুলিয়া সহরে Townshopping market তৈয়ার হলো এবং সেখানে বিভিন্ন দোকান, হোটেল, সেলুন, খোবীখানা ইত্যাদি খোলা হলো।

হাই স্কুলের বাড়ী তৈয়ার হলো। প্রাথমিক স্কুল যা প্রথমে তাঁবু ও শিমূল গাছ তলায় ছিল তা তৈরী বাড়ীতে গেল। হাই স্কুল সংগঠনের জন্য বিপ্লবী নেতা রসময় গুরুকে আহ্বান করে আনা হয়।

পরবর্তী সময়ে যতদূর মনে পড়ে ৩ স্তরে ১৯৫৬-৫৭ সালে ফুলিয়া জনসংগঠন কেন্দ্র ফুলিয়া গ্রাম্য পাঠাগার, রবীন্দ্র উদ্ভান রঙ্গমঞ্চ বিজয়া মেলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার সাহিত্য লৈকত

বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া ৮৭

ও বলিষ্ঠ রূপ দেবার মূলে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীগনেশ রায় মুখা ভূমিকা নিয়েছিলেন, আজকেও তার সক্রিয় ভূমিকায় ভাঁটা পড়েনি এখনও দেখা যায় ফুলিয়া কলোনীর বিভিন্ন কল্যাণকামী কাজে সে নিযুক্ত।

সারা ভারতে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৫২ সাল নাগাদ। এস. কে. দে মহাশয় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেলেই সারা ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্ব নেবার।

১/১১/৫২ ফুলিয়া পুনর্বসতি উপনগরীর ভার পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের উপর অর্পিত হলো কেন্দ্রীয় সরকারের agent হিসাবে। ফুলিয়া উপনগরীকে কেন্দ্র করে ১টা অঞ্চলকে নিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা হলো।

খুব সম্ভবত ১৯৫২ এর শেষার্ধ্বে শ্রীএস, টি, ব্যানার্জী এলেন Administrator হয়ে। ফুলিয়া উপনগরীর দায়িত্ব ভার নিলেন। পরে C.D Project এর Project Officer হলেন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দুই Scheme এর কাজই দ্রুতবেগে চলতে থাকে। এরপর নতুন Administrator এলেন। কিন্তু ফুলিয়ার পুনর্বসতির সমস্যাগুলো তার মূল ভাবধারায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না।

Co-operative farming এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন প্রশান্ত শঙ্কর মজুমদার। কিন্তু তা' টিকলোনা।

সমস্ত Co-operative গুলো ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেলো। কারণ, বাস্তুত্যাগী যারা এলেন তারা ব্যক্তি স্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে এসেছিলেন যা তখন স্বাভাবিক ছিল। সেই মানসিকতা ত্যাগ কঠিন মনে করলেন। সুতরাং ব্যক্তির বাড়ী, ব্যক্তির জমি, ব্যক্তির জমির মূল্য ব্যক্তিরই এইসবই প্রাধান্য পেল। সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা স্তিমিত হয়ে গেলো। ফুলিয়ার সমস্যাগুলির সমাধান আজও হয় নাই।

ফুলিয়ার সমস্যাগুলি যতদূর জানি তা হলো—

১। চাষীর জমি বাড়ী, ভাড়া লোক চাষীদের জমি বাড়ী এসব দলিল করে অর্পিত হয়নি।

- ২। মডেল ফার্মটি পূর্বে যেকোন জমজমাট ছিল তা' আর পূর্বকার মত নেই।
- ৩। যে হেলথ সেন্টারটিতে প্রত্যহ বেশ কিছু Maternity clinic এর কাজ ও ইনডোর চিকিৎসা হতো তা এখন বন্ধ।
- ৪। ৩০/৩৫টি বাড়ী ছাড়া সহরের বাড়ীগুলোর উপযুক্ত দলিল করে অর্পিত হয়নি।
- ৫। কৃষি ট্রেনিং কেন্দ্র, মহিলা শিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়ার্কসপ সবই ঝিমিয়ে পড়া অবস্থায় পড়ে আছে।
- ৬। Polytechnic এর বর্তমানে স্তিমিত অবস্থা।
- ৭। ফুলিয়া সহরের আশে পাশে সরকারের নিজস্ব জমিতে ক্রমশ কে বা কাহারো বসে যাচ্ছেন।
- ৮। C. D. P. পরিকল্পনায় যে কৃষি সেচের জলের জল Humepipe factory গড়ে উঠেছিল তা একেবারে অচল হয়ে পড়ে আছে।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান প্রয়োজন। ঝিমিয়ে পড়া সংস্থাগুলোর পুনরুজ্জীবন, জমি বাড়ীর দলিলের সমস্যা নিরসন, পলিটেকনিককে I. T. I. এ পরিণত, স্নাতক পর্যায়ের কলেজ স্থাপন, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। ফুলিয়া শহরের বাজারটিকে Textile Trg. Centre এ (হাত তাঁত এবং কল তাঁতের জল) পরিণত করা যায় কীনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৮২, এই উপনগরীর স্রষ্টা অধ্যক্ষ এস, কে, দে মহাশয় এ সহরে এসে উপনগরীর সার্বিক অবস্থা দেখে পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলি জেনে গেলেন। স্থানীয় উপনগরী পঞ্চায়েত এক স্মারক লিপিতে সমস্যাগুলির কথা জানিয়েছেন। এখানকার নাগরিক কমিটিও বেশ কিছু দিন পূর্বে থেকেই এবিষয়ে চেষ্টা করছেন। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই উপনগরীর সৃষ্টি হয়েছিল তাহার গতিকে স্তব্ধতা থেকে পুনঃ জাগ্রত করে সম্পূর্ণায়নের পথে নিতে চেষ্টা করার ভার পঞ্চায়েৎ ও নবসংগঠিত নাগরিক কমিটি নিয়েছেন মনে হয়। এবং আশা করব তাদের প্রচেষ্টা সত্যরই সাফল্য লাভ করুক।

With Best Wishes from—

M/s. Kamala Stores

RANAGHAT, NADIA

General Merchant & Govt. Contractor.



Prompt service & best honesty is our asset.

ফোন : কুলিয়া ৩৫

রূপ ও বৈচিত্র্যের প্রতীক—

গীতাঙ্গী জুয়েলারী

রতনবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া।

খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মিতা ও রূপার
গহনা বিক্রেতা।

আমাদের তৈরী রূপার গহনা গ্যারেণ্টিসহ বিক্রয় হয়।

নিশ্চিত থাকুন, রূপার গহনা কখনো কালো হইবে না।

উপক্ষিতা উপনগরী—ফুলিয়া

সুবীল চন্দ্র দাস

“মালী জাতি ছিল পূর্বের মালক এ থানা

ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা।

গ্রামেই ফুলিয়া জগতে বাখানি

দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী ॥”

—কুন্তিবাস

কুন্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে তাঁর জন্মস্থানের বর্ণনা উপরোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই গ্রামেই ফুলিয়া কালের অতলতলে মালিপোতা-বেলগড়ের মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। “সে ফুলিয়া নাই, সে জাহুবী নাই, সে কুন্তিবাস নাই কিন্তু কুন্তিবাসের কথা, কুন্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবেনা।” স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২২ বঙ্গাব্দে ফুলিয়াতে কুন্তিবাস স্মরণ সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, উপরোক্ত উদ্ধৃতি সেই প্রবন্ধের কয়েকটি ছত্র মাত্র। সেই ফুলিয়া নাই ঠিকই কিন্তু ফুলিয়া নামটি কুন্তিবাস স্মৃতিধন্য হয়ে আজও “জগতে বাখানি।” সেই ফুলিয়ার অনতি দূরেই গড়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীর নতুন ফুলিয়া। কুন্তিবাসের কালের সেই “দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী” আজ আর নেই, কিন্তু দক্ষিণ প্রবাহিনী গঙ্গা আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। আলোচ্য ফুলিয়া উপনগরী বর্তমান গঙ্গা প্রবাহ তথা কুন্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রাম থেকে অনধিক আড়াই মাইল পূর্বদিকে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ—শান্তিপুর লাইনের ফুলিয়া স্টেশন সংলগ্ন। যদিও পরিকল্পনা ছিল নগর গড়ার কিন্তু নগর গড়া সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এখন যা’ অবস্থা তা’তে না নগর না গ্রাম।

দেশভাগের ফলে ১৯৫০ সালে যখন কাতারে কাতারে মানুষ এপার বাংলায় আছড়ে পড়ে তখন কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্পে পাঞ্জাবের নিলোথেরী উপনগরীর প্রকল্প রচয়িতা সাহিত্য সৈকত

বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—৯১

ঐক্স এস্ কেদে মহাশয়ের তহাবধানে নিলোথেরীর অমুরূপ এক উপনগরী গড়তে চেয়েছিলেন এই ফুলিয়াতে। প্রকল্প অনুসারে স্থান নির্বাচিত হয় বুঁইচা মৌজার এক বৃহৎ অংশে। যে অংশ ছিল কার্যাত অমুরের অনাবাদী। সেই বালুময় অনাবাদী জমির কাশবন—উলুবন—ঝোপঝাড় ঘেরা, উই টিপি ভরা, সরিস্থপ সঙ্কুল জমি পরিস্কার করে শুরু হয় কর্মসূত্র। প্রস্তাবিত নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গড়ে ওঠে “কৃষিপল্লী”। উদ্দেশ্য উদ্বাস্তু কৃষক পরিবার সেইখানে ঠাই পাবে, বসতি গড়বে, চাষের জমি পাবে চাষাবাদ করবে। তারাই প্রস্তাবিত নগরীর প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য উৎপাদন করবেন, খাটের যোগান দিবেন। তারই পাশাপাশি গড়ে উঠে “সবুজপল্লী”। এখানেও ঠাই পাবেন উদ্বাস্তু ভদ্র কৃষক পরিবার, বসতি বাটি পাবেন, চাষের জমি পাবেন, তারা উপনগরীর প্রয়োজনীয় শাক-সব্জি, ফল-মূল, কাঁচামাল উৎপাদন করবেন, যোগান দিবেন। এই দুই শ্রেণীর কৃষক পরিবারের ছেলে মেয়েদের হাতে কলমে উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সল্লিকটেই গড়ে ওঠে সরকারী কৃষি ফার্ম ও তৎসহ কৃষি বিদ্যালয়।

প্রস্তাবিত নগরীর প্রকল্প অনুসারে নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন পেশার উদ্বাস্তু পরিবারের বসতি। প্রাচীন বালার পল্লীর ধাঁচে গড়ে ওঠে বসাকপাড়া, কামারপাড়া কুমোরপাড়া ইত্যাদি তৎসহ বসতি পেল বারুজীবী, ধোপা-নাপিত ইত্যাদি। উদ্দেশ্য মহৎ যে যার পেশায় থেকে উপনগরীর প্রয়োজন মিটাবে। এমনি করে উপনগরী হয়ে উঠবে এক স্বয়ং সঙ্কীর্ণ নগর। সেই সব বিভিন্ন পেশার উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে হাতে-কলমে উন্নততর শিল্প শিক্ষা দিয়ে শূদক্ষ কারিগর রূপে গড়ে তোলার জন্ত গড়ে ওঠে ফুলিয়া পলিটেকনিক স্কুল।

অপরদিকে নগরীর মূলক্ষেত্রে গড়ে ওঠে, সচিবালয়, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পোস্টঅফিস, গেটহাউস উদ্যান ইত্যাদি। তৎসহ নগর বাসীর বসতি বাটি, আর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা জুড়ে গড়ে

ওঠে শিল্পাঞ্চল। শিল্পাঞ্চলে গড়ে ওঠে টাঙ্গাইল টেক্সটাইল (কাপড়ের কল), সীট মেটাল, আর, সি, সি. পাইপ কারখানা, কাগজকল ইত্যাদি। পরিকল্পনা মত কাজও এগিয়ে ছিল অনেকটাই কিন্তু দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ বাসীর, দুর্ভাগ্য নদীয়া বাসীর তথা ফুলিয়া বাসীর। উক্ত পরিকল্পনাটি হঠাৎ কোন এক অদৃশ্য কালো হাতের খাবায় মাঝ পথেই ভেঙে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ওই অসমাপ্ত উপনগরীটির দায় দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়ে হাত-পা ধুইয়ে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়ালেন। কি কারণে যে হঠাৎ এই প্রত্যাশার ও প্রস্থান সাধারণ মানুষ অজ্ঞাবহি তার হৃদয় পেল না। তবে এর পশ্চাতে আরও একটি কারণ ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। তিনি যদি সচেষ্ট থাকতেন তবে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিনা সন্দেহ। মনে হয় সেই সময় ফুলিয়া অপেক্ষা তাঁর মনজুড়ে বসেছিল তাঁর মানস কন্যা কল্যানী উপনগরী গড়ার স্বপ্ন। এ ছাড়া একই সময়ে একই জেলাতে এত কাছাকাছি দু'টি উপনগরী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তথা আর্থিক সম্ভবতার যোগান দেওয়া কঠিন ছিল বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ফুলিয়া অপেক্ষা কল্যানীই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অগত্যা প্রস্তাবিত ফুলিয়া উপনগরী অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় উপেক্ষিতাই থেকে গেল।

প্রথম পর্ব উপনগরীর বাসিন্দাদের মনে যে উৎসাহ উদ্বোধন জ্বলিত ক্রমে ক্রমে তা নিভে আসে। প্রথম উৎসাহে ফুলিয়ার কতিপয় উৎসাহী মানুষ যাদের কয়েকজনের কথা বিশেষ মনে পড়ে যেমন ৬কুলদা রঞ্জন মজুমদার, ৭নরেশ সোম, ৮রাজেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, ৯শ্রীচরণ চন্দ্র জোয়ারদার, ১০গণেশ চন্দ্র রায়, ১১মোহনলাল সরকার ইত্যাদি আরও অনেকে, যাদের চেষ্টায় পরবর্তী কালে গড়ে উঠেছিল ফুলিয়া বালিকা বিজ্ঞালয়, ফুলিয়া রঙ্গমঞ্চ, ফুলিয়া লাইব্রেরী, ফুলিয়া রেল বাজার ও তৎপরে

তৎসংলগ্ন ফুলিয়া সমবায় বাজার ইত্যাদি, এছাড়াও তখন সরকারী কর্মীদের কিছু সংখ্যক ছিলেন- জনদরদী ও ফুলিয়ার উন্নয়নের সহযোগী যেমন ৩১বৈষ্ণবনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মানসগোবিন্দ সেন, দিলীপ দাশগুপ্ত, সাধন দাশগুপ্ত ইত্যাদি। বিশেষ করে ফুলিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, সাধন দাশগুপ্ত, দিলীপ দাশগুপ্ত, শিল্পী যুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানসগোবিন্দ সেনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তারপরে সময়ের পরিবর্তনে ও যুগযন্ত্রণায় সেই উৎসাহ উদ্দীপনার ভাঁটা পড়ে যায়। আবার উদ্দীপনার জোয়ার আসবে এই আশায় বলতে চাই স্থানীয় জনসাধারণ সমবেত ভাবে এগিয়ে না এলে, কাপিয়ে না পড়লে, সে এলাকার উন্নয়নে কি সরকার, কি দেশবাসী কেউ কি তেমন করে এগিয়ে আসে? কখনই না। এই তো সেদিন কল্যাণী এমন কি গয়েশপুর কাটাগঞ্জ এলাকাও ‘নোটিফায়েড এরিয়া’ রূপে সরকারী স্বীকৃতি পেল। সেই তুলনায় ফুলিয়া তো আরও আগেই নোটিফায়েড এলাকা হতে পারত। কেননা একটা পৌর শহর বা নোটিফায়েড এলাকায়—যে অবস্থা ও ব্যবস্থা থাকে দরকার ফুলিয়াতে তার সব কিছুই বর্তমান। কিনাই—পাকা রাস্তা আছে, পাকা বাড়ী আছে, আলো আছে, জল আছে, জলকল আছে, বিদ্যুৎ আছে, অফিস, পোষ্টঅফিস, হাট-বাজার, রেল সবই আছে। নাই উত্তম, নাই সরকারী প্রচেষ্টা। প্রয়োজন স্থানীয় জন সাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উৎসাহ উত্তম।

নোটিফায়েড বা পৌর এলাকা ঘোষিত না হলে ফুলিয়া উপনগরীর যেটুকুও গড়ে উঠেছে সেটুকুও থাকবে কিনা সন্দেহ। কারণ এমনিতেই বর্তমানে স্ব-স্ব এলাকায় সকলেই সম্ভার মস্তান। তার উপর আছে হরেক রকম দলবাজী। এতেন অবস্থায় সমষ্টি-গত উন্নয়ন সংঘবদ্ধ দৃঢ়চেতা উত্তম ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, আর সর্বত্র অসুন্দরের দাপাদাপিতে সুন্দর তিরোহিত হতে চলেছে। ফুলিয়াও তা’ থেকে বাদ পড়েনি। প্রথমেই মনে পড়ে কৃষি কার্ম তথা কৃষি বিদ্যালয়টির কথা। কে বলবে দশ বছর আগেও সেখানে সবুজের বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—৯৪

সমারোহ ছিল, শস্যশ্রামল ঝলমল ছিল, ফুলের বাগান ছিল, শ্রী ছিল, সুন্দর রূপ ছিল, কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য—হাজ ওই পথে কেউ গেলে ভাবতেই পারবেন না ওটা ‘কৃষিকার্ম’। মনে হবে অন্তর জুড়ে হাহাকার নিয়ে রোগগ্রস্তা জননীর মত শুয়ে আছে এক ফালি মরু ধূসর প্রান্তর। তারপরে তাকিয়ে দেখুন—গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দিকে অবস্থা তথৈবচ। হাসপাতাল কোন মতে নাড়ী টিপে চলছে। শিল্পাঞ্চলে শিল্প উদ্যোগ, পলিটেকনিক—‘বুক যুক-পুক’। সবচেয়ে পীড়াদায়ক ‘রবীন্দ্র উদ্যান’, কেউ দেখার নেই। ফুলগাছ তো দূরের কথা—কাঁটা গাছও জন্মাতে ভয় পায়। দুর্ভাবাস পদাঘাতে তিরোহিত। নীরব সাক্ষী তার শিল্পী মুহূর্ত বন্দোপাখ্যায় কৃত রবীন্দ্রনাথের পাথরের মূর্তিখানি। এই অবস্থায় ফুলিয়াকে বাঁচাতে হলে আরও সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে হলে দলমত নিবিশেষে ফুলিয়ার জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে সোচ্চার হতে হবে নোটিফায়েড এরিয়া অথবা পৌর এলাকা ঘোষণার দাবী নিয়ে। কারণ অম্লরূপ স্বশাসিত সংস্থাই পারবে ফুলিয়াকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে উপনগরীর পর্যায়ে উন্নীত করতে।

ফুলিয়া তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

চট্টাকাতলা বসাকপাড়া, পোঃ—ফুলিয়া বয়রা,
জেলা—নদীয়া।

টাক্সাইল শাড়ী প্রস্তুতকারক তাঁত-

শিল্পীদের বিজয় প্রতিষ্ঠান

সুলভে অভিনব ডিজাইন ও রঙের টাক্সাইল শাড়ী
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের একমাত্র

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

বিঃদ্রঃ—মঙ্গলবার পূর্ণ দিবস সমিতি বন্ধ থাকে।

ফুলিয়া উপবগবীর সন্মাজ

গনেশ রায়

কর্ম সংস্থানের সুযোগের জন্মেই ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে ফুলিয়াতে আমার প্রথম আসা। সেই থেকেই ফুলিয়ার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য বন্ধন। চোখের সামনে এই শহরটাকে গড়ে ওঠতে দেখেছি। চোখের ওপর দিয়েই এর ৩২ বছর অতিক্রান্ত হতে দেখলাম। এই শহরের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমারও আনন্দ বেদনা জড়িয়ে রয়েছে।

আমি যখন চাকুরী সূত্রে এখানে আসি তখন শ্রীযুক্ত প্রতিভু গুহঠাকুরতা ছিলেন এই শহরের এডমিনিষ্ট্রেটর, ডি. বি, দেশাই, ডি, এল, নন্দা ছিলেন ইনজিনিয়ার এবং প্ল্যানিং ইনজিনিয়ার। বি, এন, মাথুর এসিষ্টেন্ট ইনজিনিয়ার এবং অফিসের যিনি ছিলেন শিরোমণি তাঁর নাম কে, এস, রাও। এ ছাড়া আমরা অনেকেই ছিলাম এঁদের সহকারী।

আমার চাকুরীগত পদটা ছিল ছোট কিন্তু দায়িত্বটা ছিল বেশ বড়। শহরের বাড়ীঘর রাস্তাঘাট করা জল এবং আলো সরবরাহের জিনিস পত্র যোগান দেবার দায়িত্ব ছিল আমার।

যাঁদের নামোল্লেখ করলাম, নামোল্লেখের কারণ এঁদের মধ্যে যে কাজের প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শহরটা গড়ার পেছনে এঁদের যে মমত্ব বোধ আমরা দেখেছি তা' দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তাঁদের এই কাজের প্রতি দরদ আমাদেরকেও কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ফুলিয়া শহরটায় বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তু ভাইদের এনে পুনর্বাসন দেবার বন্দোবস্ত হয়। আমরা যারা সরকারী কর্মচারী হয়ে এখানে এসেছিলাম চাকুরী সূত্রে থাকার বাসস্থান পাই। অতঃপর যেহেতু আমরাও পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত ছিলাম, কর্মচারীদের তরফ থেকে স্থায়ী বাসস্থানের দাবী জার্নালে মাইনের টাকা থেকে মাসিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট টাকার

অংক কেটে রাখার বন্দোবস্ত বিনিময়ে বাড়ীগুলোতে আমাদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়।

নতুন শহর গড়ে ওঠার পর ফুলিয়া উপনগরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষ নিয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। এখানে ঘারা পুনর্বাসন পেয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পাবনা জেলার অধিবাসী।

কিন্তু বিভিন্ন জেলার ছিন্নমূল এই মানুষগুলো নিয়ে যে সমাজ গড়ে ওঠেছিল তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একটা একাত্মবোধ। পরস্পরের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠেছিল। আমরা বাস্তবচারা এটা আমরা অনুভব করতে পারিনি। পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাওয়া আসা, একের অসুবিধায় অন্যের বাড়ীতে আহায়ে আমাদের কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আমরা যেন সবাই এক পরিবারভুক্ত এরকম একটা বোধ নিয়েই গড়ে ওঠেছিল ফুলিয়ার সমাজটা। এখনও আমার মনে পড়ে আমাদের সকলের সেই ঘোষাল মাসীমা, বোস মাসীমা ও ঘোষ মাসীমার যত্নের কথা। সেই সমাজটা আজ আর নেই। সেই একাত্মের বন্ধন আজ—

আমরা যখন প্রথমে এই শহরটায় এসেছিলাম কারোরই তেমন আর্থিক সচ্ছলতা ছিলনা। অভাব অ মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে। এরই মধ্যেও আমাদের উৎসাহে অভাব ছিলনা। আমরা স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব নামে একটা ক্লাব করেছিলাম। পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউশনে প্রথম ভূর্গোৎসব করি ১৯১০ সালে। ১৯৫১ সালে অবিষ্টি পূজো হয়নি। ১৯৫২ সাল থেকে এখন অবধি হয়ে আসছে ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনের ভেতর ও বাইরের মাঠে। এটাই শহরের আদি সর্বজনীন ভূর্গোৎসব। এখনতো অনেক পূজো হচ্ছে। শহর এবং আশপাশ অঞ্চল মিলে ৫০/৬০ টি পূজো হবে।

১৯৭৬ সালে সরকারী উদ্যোগে এবং খরচার জনরঞ্জন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালে আমরা কয়েকজন মিলে এর পরিচালন ভার গ্রহণ করি। গ্রাম ও শহরের সকলকে একত্রিত করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। আমরা তা' করতেও পেরেছিলাম।

জনরঞ্জন কেন্দ্রে তখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। জনরঞ্জন কেন্দ্রের উদ্যোগেই বিজয়া মেলা, রঙ্গমঞ্চ, গ্রাম্য পাঠাগার রবীন্দ্র উদ্ভান ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলার সময় জনরঞ্জন কেন্দ্র জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ কিছু অর্থ আদায় করে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে জনরঞ্জন কেন্দ্রের সম্মুখ থেকে স্টেশন অবধি একটি কাদাময় রাস্তা আমরা ছোট বড় সকল কর্মী কায়িক পরিশ্রম দিয়ে রাস্তায় ইট ফেলে করেছিলাম। এই কাজে কিছু সরকারী আর্থিক সাহায্য এবং বাকীটা জনসাধারণের কাছ থেকে তোলা হয়েছিল। বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন এযাপারে অনেকেই। ডাঃ অনাথ বন্ধু অধিকারীর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। তীর্থ নিবাস পল্লীর বাসিন্দাদের এই কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

এগুলো বলার কারণ ৩০ বছর আগে সমাজের কল্যাণের জন্য এখানকার মানুষের যে নিরলস চেষ্টা, উত্তম ও ইচ্ছা ছিল আজ আর তা' নেই।

এখন ফুলিয়ার জন জীবনে অনেকেরই অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ এসেছে। খাওয়া-পরা টানাটানি ঘুচেছে। কিন্তু সেই সামাজিক মনটা আর নেই। এখন আলাদা আলাদা সমাজ গড়ে ওঠে—বিস্তবানদের সমাজ, অফিসারদের সমাজ, সাধারণ চাকুরীয়াদের সমাজ, শিক্ষিত—অশিক্ষিতদের সমাজ চাষীদের সমাজ, বোম্বদের সমাজ এরকম। এখন আমরা হাজার হাজার টাকা একদিনের নাম সংকীর্ণন করে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু একটি কাদার রাস্তাকে পাকা করার কথা ভাবিনা বা কোন সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা করিনা।

ফুলিয়া শহরের শুরুতে দেখেছি নিজের ইচ্ছাতেই বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডাক্তার রোগীর খোঁজ খবর নিয়েছেন ঔষধ দিয়েছেন। এটা শুধু নতুন ডাক্তারের পসারের কথা ভেবে নয় একটা আন্তরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠেছিল। আজ রুগীর হাতে পয়সা না থাকলে খালি শিশি নিয়ে ফিরে আসতে হয়। বিস্তবান লোকেরা ছুটেছে আরো বিস্তের সন্ধানে, ব্যবসায়ীরা মুনাফা লোটার নেশায়,

পেশাগত লোকেরা তাদের পেশার উন্নতির পেছনে, বিষয়ী লোকেরা বিনা বায়ে বিনা পরিশ্রমে বাড়ীঘর, জমি জিরেতের চিন্তা করে যাচ্ছেন এমনি করে সবাই যে যার সুখের কথা ভেবে ছুটছেন। সমাজের কথা, অশু মানুষের কথা ভাববার সময় ও ইচ্ছা কারো বিশেষ নেই। রাজনীতিবিদরাও নিজেদের দল সামলাতেই এবং দলগত কাজ করতেই ব্যস্ত। এ অবস্থায় সমাজের মঙ্গলের জন্তে কাজ করে কে ?

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি যুবকরাই দেশের হাতিয়ার। ফুলিয়ার আজকের যুবকদের মধ্যে গঠনমূলক কাজের প্রবণতা প্রায় নেই-ই। পুজো-আচার উৎসব করে তারা যে শ্রম ব্যয় করেন তা' দিয়ে বহু গঠনমূলক কাজ করা যেতো।

শুধু যুবকদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। সেই রকম পরিবেশও নেই। আমাদের সকলেরই উচিত আমরা যে যা করছি তা দিয়ে উত্তর কালের পথ কতটা প্রশস্ত হচ্ছে তা' ভেবে দেখা।

সরকারি টিহান ওয়ার্কস (বি, ডি, ও অফিসের নিকট) আপনার মনের মত ফার্নিচার, তাঁতের সরঞ্জাম, বিভিন্ন প্রকার কাঠের লগ শালের সাইজ কাঠের জন্ত আসুন আমার এখানে। প্রাঃ—অরুণ সরকার ফুলিয়া, নদীয়া।	শিকারপুর অঞ্চল ব্যানানা প্যাগায়া এণ্ড ভেজিটেবিলস প্রোভিডেন্সারস্ কো-অপাঃ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ ☆☆ ★ বিক্রয় কেন্দ্র ফুলিয়া ফুলিয়া কোঃ অপাঃ মার্কেট। শ্রাঘ্য মূল্যে সিঙ্গাপুরি কলা ক্রয়েচ্ছু গণকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কলা বড় প্রতি জোড়া—০°৩৫ পঃ ,, ছোট ,, ,, —০°২৫ পঃ
---	---

With Compliments
Best FROM

Asit Bose

**Fulia Upanagari
NADIA**

With Compliments From :—

Sri Nimai Chandra Karmakar

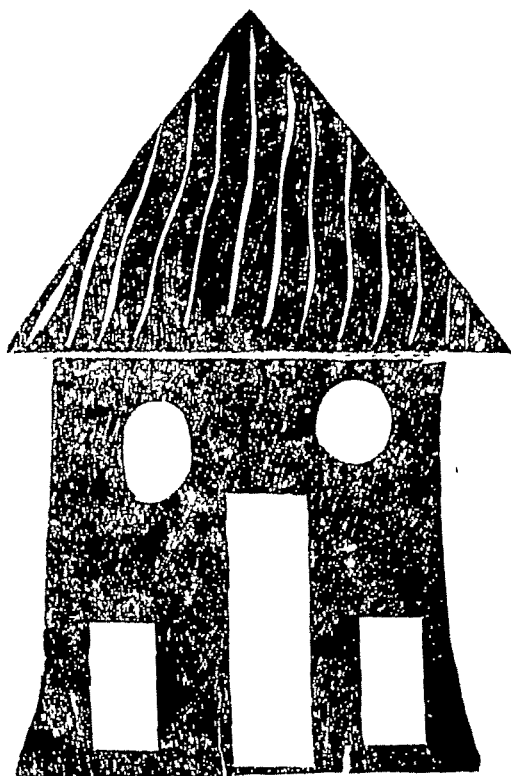
GOVT. CONTRACTOR

For

**Construction of Building & Specialist in
Deep Tube-Wells.**

Taherpur 'A' Block, Road No 21

P.O. Taherpur, Dist. Nadia.



পাঁচ বছর বয়সের একটি শিশুর আঁকা ঘর।

ফুলিয়ার মাটিতে কৃষিবাসের উত্তরকাল

মাধব ভট্টাচার্য

মানুষের চিন্তা চেতনার বিবর্তনই তো যুগ পরিবর্তনের ইতিহাস — আর যুগে যুগেই তা' ঘটে এসেছে প্রতিটি দেশে এমন কি প্রতিটি জনপদের মধ্যেই।

একটু পেছন ফিরে তাকিয়ে যদি ফুলিয়ার কথা ভাবা যায় তো ফুলিয়ার সব থেকে বড় পরিচয় কবি কৃষিবাস এবং তাঁর ভিটে।

কৃষিবাসের পর থেকে প্রায় যে পঁচিশ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে এসেছে সে সময় সীমার মধ্যে এই পল্লীর কোলে কত মানুষের জন্ম-মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা তাদের জীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রেখে গেছেন তাদের প্রজন্মের কাছে কিন্তু বিরাট মহীরুহের নীচে কোন তৃণই যেমনি চোখে পড়েনা কৃষিবাসের পর ফুলিয়ার উত্তরকালটা অনেকটা তেমনি।

কৃষিবাসের পর থেকে বর্তমান কালের ফুলিয়া অবশি উল্লেখ্য ঘটনা বড় কিছু একটা নেই।—না রাজনৈতিক না কোন সামাজিক বিপ্লব।

গঙ্গার ধার ঘেষে ছিল ঘন জনপদ। কৃপণ জমিদারের শোষণ চলে এসেছে একই ট্র্যাডিশনে নিরন্ন দরিদ্র প্রজার ওপর। সাধারণ মানুষের মুখে সেদিন ছিলনা ভাব প্রকাশের মত ভাষা। দারিদ্র এবং অশিক্ষার যাতাকলে তারা পিষ্ট হয়েছেন বংশানুক্রমে।—আর তাদের নিরলস শ্রমে পুরুষানুক্রমে পুষ্ট হয়েছেন সদা অলস জমিদার তনয়েরা। এই চিত্র তো শুধু ফুলিয়ার নয়, গোটা দেশ জুড়েইতো তখন এই সামন্ত প্রথা।

সাম্প্রতিক কালের ফুলিয়া কৃষিবাসের সময়কার সেই গ্রামটি আর নেই। গঙ্গা পশ্চিম তীরের জনপদকে গ্রাস করছে ক্রমাগত। গত এক দশকের মধ্যে বহু বাড়ী ঘর গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বিস্তিচক, চম্পকলতা গ্রাম তো একেবারেই গঙ্গা গর্ভে।

নীলকরদের একটি বাড়ী, একটি পাতাল কুঁয়ো, বিরাট বিরাট কয়েকটি বটগাছ গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে। তারাপুর যাবার পথে রাস্তার ধারে একটি বেশ বড় বটগাছ ছিল ৬/৭ বছর আগেও। সেই গাছে বেশ ক'টি বৃদ্ধ হুম্মান দম্পতিকে তাদের উত্তর পুরুষদের নিবে বাস করতে অনেকেই দেখে থাকবেন। সেই গাছটিও গঙ্গাগর্ভে। হুম্মানদেরও আর দেখা যায়না। বছর ৪/৫ আগেও লোকমুখে শুনেছি একটি ভালো ঝোলানো লোতার সিঁদুক নাকি গঙ্গায় গড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া মোহর, কুঁয়ো খুঁড়তে গিয়ে নৌকোর হাল, লোতার ছোট কামান এসব পাওয়ার কথাও শোনা যায়।

কুস্তিবাস ভিটে এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলই হচ্ছে এতদঞ্চলের আদি এবং বর্তমান গ্রাম। শিমুলিয়া, মালিপোতা গ্রামে এখনও প্রায় দু'শ আড়াইশ বছরের পুরোণ বাড়ী আছে। ৮পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীর তুর্গোৎসব এ অঞ্চলের সবথেকে পুরোণ পুজো। প্রায় দু'শ বছর ধরে এই তুর্গোৎসব চলে আসছে বলে শুনেছি।

ফুলিয়ার সবথেকে প্রাচীন যে মানুষটা এখনও বর্তমান তাঁর নাম জীবলাই ঘোষ। বয়স ১০৫ বছর। একটি কিশ্বদস্তী কথো শোনালেন তিনি সেদিন। কিশ্বদস্তীটি হলো—কুস্তিবাস গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করছিলেন একদিন। একটি পুস্তক ভেসে এলো তাঁর কাছে। তিনি সেটা হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। দেখলেন রাম সীতার কথা লেখা। স্বয়ং রাম সীতাকেও দেখতে পেলেন কুস্তিবাস সেই জলে। এরপরই তিনি বটগাছ তলায় বসে রামায়ণ লিখতে শুরু করেন। গঙ্গার জলে বেখানটায় কুস্তিবাস রাম সীতাকে দেখেছিলেন এবং বই পেয়ে-ছিলেন সে জায়গাকে রামসাগর বলে।

কিশ্বদস্তীটির কথা আমি আর কারো মুখে শুনিনি। তবে রামসাগরের কথা অনেকের মুখেই শুনেছি। কুস্তিবাস ভিটেয় যে বটগাছটি আছে তার উত্তর দিকটার খাদের মত নীচ জমি রয়েছে। অনেকেরই অনুমান কুস্তিবাস সম সাময়িক সাহিত্য সৈকত

কালে ঐদিক দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত হতো। তারপর গঙ্গা অনেকটা উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যায়।

এই খাদের নীচু জমিটাই রামসাগর নামে পরিচিত। গঙ্গার ধার শেষে মাঠের পর মাঠ পাট চাষের মত নীলের চাষ হতো এক সময়ে।

যে বটগাছ তলায় বসে কবি কুস্তিবাস রামায়ণ লিখেছিলেন অনেকেরই অনুমান সেই বটগাছটি নেই। বর্তমান শান বাঁধানো বটগাছটি মূলগাছের কুরি নিঃসৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই বটগাছ তলায় প্রায় ৭০/৭৫ বছর ধরে কুস্তিবাসের জন্মদিনে তাঁর স্মরণে স্মরণোৎসব বসে প্রতি বছর। ১৯৬৬ সালে একটি স্মৃতিফলক নির্মিত হয়। বটগাছটির অনতিদূরে কুস্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালার বাড়ীটি। ১৯৬৪ সালে সরকারী অর্থ ব্যয়ে বাড়ীটি তৈরী হয়। এই বাড়ীটি যেখানে নির্মিত হয় অনুমান করা হয়, কুস্তিবাসের বসত বাড়ীও ওখানটাতেই ছিল। বাড়ীটির কাছাকাছিই কুস্তিবাসের সমাধি স্তম্ভ। যখন হরিদাসের সাধন পীঠও এরই কাছাকাছি।

কুস্তিবাস সংগ্রহশালায় কুস্তিবাসের ব্যক্তিগত সংগ্রহ বলতে কিছু নেই—একটি পুঁথিও নয়। তবে সংগ্রহশালায় প্রায় ২৫০টি মত রামায়ণ এবং রামায়ণ বিষয়ক বই আছে বিভিন্ন ভাষার। শিল্পী মৃৎল বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত রামায়ণের চিত্রালেক্ষ্য আছে ১৬টি মত। এ ছাড়া অগ্ন্যস্ত্র বইয়ের সংগ্রহ প্রাশংসনীয়। রামায়ণ বিষয়ক যাবতীয় সংগ্রহে গ্রন্থাগারিক জীকেশব লাল চক্রবর্তীর উৎসাহের অন্ত নেই।

বেলগড়িয়া গ্রামে কৈলাস মুখার্জী বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। জজ সাহেব বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। জজ সাহেবের বাড়ীর কোন চিহ্নই এখন আর নেই। তবে ভিটেটা আছে। সেই ভিটের সম্মুখেই একটি দালান বাড়ী আছে। বাড়ীর দেয়ালে লেখা আছে—বেলগড়িয়া চারিটেবল ডিসপেন্সারী স্থাপিত ১৮৯৫। যতদূর শোনা যায় জজ সাহেবের একটি ছেলে চিকিৎসার অভাবে মারা গেলে জজ সাহেবের মনে খুব

হয়। তিনি স্থানীয় 'লোকের' চিকিৎসায় সুবিধার্থে এই ডিসপেন্সারীটি তৈরী করে দেন। ডিসপেন্সারী ওঠে গেছে বহুদিন। বাড়ীটিতে এখন প্রাথমিক স্কুল বসে।

শ্রীমতী লতিকা চ্যাটার্জী একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। ৬০ বছর ধরে তিনি বাস করছেন শিমুলিয়া গ্রামে। তত্ত্বসাধক ৮রামানন্দ গোস্বামী বংশের কন্যা তিনি। রামানন্দের ভিটেমাটি আগলেই রয়েছেন এখনও। রামানন্দকে তিনি কৃষ্টিবাস সম-সাময়িক কালের মানুষ বলে মনে করেন।

রামানন্দের বাড়ীর ঠে অংশ এখন ধংসস্থাপে পরিণত। মাটির তলাকার ইট তুলে তুলে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। যে অংশটুকু এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা' দেখে অনুমান করা শক্ত পাঁচশ বছরের পুরোণ বাড়ী বলে। বাড়ীটির ছাদে ওঠার সিঁড়ি এখনও আছে অনেকই আমাকে বলেছেন বাড়ীটির ভিতর একটি পাক। সুরঙ্গ পথ আছে। ঐপথ দিয়ে পাশের শরিকের বাড়ী যাওয়া আসা চলতো। তবে এর কোন প্রামাণ্য তথ্য আমার জানা নেই।

নবলা, বেলগড়িয়া, শিমুলিয়া এবং মালিপোতায় যে এক সময় অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস ছিল তা' পুরোণ দালান বাড়ী, বিরাট বিরাট পুকুর, বাগান, পাকরাস্তা এসব দেখে অনেকটা অনুমান করা যায়। রামানন্দ, পাঁচুগোপাল, চিত্ত মুখার্জী, টুন্স মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী এঁদের বাড়ী দেখলেই খানিকটা আঁচ করা যায়। চিত্তবাবুর বাগানের ফল এখনও ফুলিয়া বাজারের চাহিদা মেটায় দেখি। নবলা ও বেলগড়িয়া গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে সে রাস্তায় রাতে আলো জ্বলত। কাঠের খুঁটির মাধ্যমে কাঁচ ঘেরা টিনের বাজের মধ্যে কেরোসিন ল্যাম্প বসানো থাকতো এ দৃশ্য ৩০/৩১ বছর আগেও অনেকে দেখেছেন বলে আমায় বলেছেন।

নবলা ও শিমুলিয়া গ্রামের সংযোগ স্থলে "পাঁচুগোপালের মন্দির" বলে একটি মন্দির আছে। তারই কাছে একটি শিবমন্দিরও

আছে। শিবমন্দিরটি পরিত্যক্ত। পাঁচুগোপাল মন্দিরের
সেবাইতদের মধ্যে একজন শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ, তার মুখে শোনা
তাদের ঠাকুরমা ৩৭বিধুমুখী ঘোষ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মন্দিরটি করেন।
তাদের অনুমান ৩শ' বছর আগে মন্দির স্থাপিত হয়। কিন্তু
শ্রীমতী কনকলতার বয়স ধরে যদি তার ঠাকুরমার কথা সত্য
যায় তো এ মন্দিরের বয়স একশ পঁচিশ' বছরের বেশী হতে পারেনা।
পাঁচুগোপালের মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। বেশ কয়েকটি রঙ
বেরঙের গোপালের মাটির মূর্তি আছে। মন্দিরের সামনে একটি
আকন্দ ফুলের গাছ আছে। মানতকারীদের ইটের বাঁধনে গাছ
নৃজ হয়ে গেছে।

বুঁইচা নিবাসী ৭৪ বছর বয়স্ক শ্রীবিভূতি আচার্য বললেন—
এখন থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে পুরোণ বুঁইচায় বিদ্যাবাসিনীর
পুজো হতো। প্রায় ৫০টি মত ভূর্গাপূজা হতে দেখেছেন তিনি গোটা
ফুলিয়ায়। তাঁরই মুখে শোনা—পুরোণ বুঁইচার একেবারে শেষ
প্রান্তে ঘেখানটায় বর্তমানে “বটতলা কলোনী” নামে একটি
কলোনী গড়ে ওঠেছে, প্রায় ৭/৮ বিঘা জায়গা জুড়ে একটি বিরাট
বটগাছ ছিল। গাছটির নাম ছিল ঠাকুরস গাছ। গাছতলায়
লোক পুজো দিত। প্রায় ১২/১৪ মাইল দূর থেকে প্রকাশ্ত এই
গাছটি দেখা যেতো। বছর ২/৩ আগে পঞ্চায়েতকর্তৃপক্ষ গাছটি
কেটে শুথানে এই কলোনীটি গড়ে তুলেন।

বর্তমান বেলগড়িয়া ও নবলা অঞ্চলের অন্তর্গত প্রায় ৮৪৬
একর জঙ্গলাকীর্ণ জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৫০-৫২ সাল নাগাদ
কেন্দ্রীয় সরকার একটি উদ্যান কলোনী গড়ে তুলেন শ্রীযুক্ত এস,
কে. দে মহাশয়ের পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে। যার বর্তমান নাম
ফুলিয়া উপনগরী।

জঙ্গলাকীর্ণ এই জায়গাটি উলুখড়, বৈচিকল আর কাশবনে
ঢাকা ছিল। কেন, তা অনেকের মনেই কৌতূহল জাগায়।
কেননা এর দক্ষিণে শান্তিপুর এবং উত্তরে বীরনগর—দু'টোই
প্রাচীন পৌরশহর। যতদূর জানা যায় এই অঞ্চলটাও বহু দিন
পূর্বে জনবসতিপূর্ণ ছিল কিন্তু একবার ওলাওঠা (পুষ্কর) নামক
বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—১০৬

সাহিত্য সৈকত

মহামারীতে অঞ্চলটা ধ্বংস হয়ে যায়। যে কয়েকজন বেঁচেছিলেন তারাও পালিয়ে যান।

যাক, ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮৩১টি বাসপোষোগী বাড়ীসহ যে নগরীটি গড়ে ওঠেছিল আজ তার সমস্তা অর্জরিত অবস্থা।

মানুষের জীবনের ৩০/৩২ বছরের বয়সীমাকে যদি তার যৌবনকাল বলি তো ফুলিয়া উপনগরীরও এখন যৌবন বয়স। যৌবন, কিন্তু হতশ্রী তার অবস্থা।

ফুলিয়া উপনগরীর যৌবন উপনগরীকে বড় কিছু সম্পদ দিতে পারছেন না। সমস্তার সঙ্গে সে লড়াই করছে বটে কিন্তু তার সমৃদ্ধি ঘটছে না শ্রী ফিরছেন না।

মনে হয় লড়াইটা চিন্তা-চেতনার সঙ্গে হচ্ছে না, লড়াইটা জীবনমুখী হচ্ছে না যা হচ্ছে তাকে বলা যেতে পারে—বিষয়মুখী।

তবে ৩২ বছর বাদে অধিকার অর্জনের তীব্র একটা তাগাদা অনুভব করছেন অনেকেই মনের মধ্যে। অধিকার অর্জনের মানসিকতা একটা সুস্থ চেতনারই লক্ষণ। মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া মানেইতো অগ্রসর হওয়া। একটা জিনিস ভাববার আছে—অধিকার অর্জন আর দান গ্রহণ এক নয়। অধিকার অর্জন করতে গেলে মানুষকে কিছু মূল্য দিতেই হবে। কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়ার মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু দানের ক্ষেত্রে তার দরকার হয় না। সেখানে শুধু চাই প্রত্যাশা বৈর্য আর কৃতজ্ঞতা বোধ।

একজনকে জ্ঞানি নিধকুড় নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ। কলোনী গড়ে ওঠার সময় সরকার কর্তৃক তার কিছু জমি অধিগৃহীত হয়। কিন্তু তিনি Compensation এর টাকা নিতে রাজী হননি। এডমিনিস্ট্রেটর, ফুলিয়া টাউনশিপ বিগত ১০/৮/৫৯ চিঠি নং RRF/Admn-22 c)/59/1024 তাকে একশও জমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৯৫৯-১৯৮৩ এই সময় সীমার মধ্যে বছর প্রতিশ্রুতি মিললেও প্রাপ্তি তার আজও ঘটেনি।

কিছুদিন আগে, স্থানীয় কয়েকজন তরুণ মিলে চেপ্টা

চালিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানিয়ে মিশনের শিক্ষাদর্শে এখানেও একটি শিক্ষালয় গড়ে তোলা যায় কীনা! পারেননি। কিন্তু হলে ভাল হতো। ফুলিয়া উপনগরীতে অবস্থিত প্রায় ১৫০ একর জমি পড়ে আছে। তার খানিকটা যদি রামকৃষ্ণ মিশন মাদার টেরিঙ্গা, ভারত সেবাপ্রম বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানকে বৃহত্তর কল্যাণ বা উন্নততর জীবনের চিন্তায় দেয়া যায় তো ক্ষতি কী?

চোখের সামনে দেখছি বহু জমিতে রাতারাতি ঘর ওঠছে। কোনটা বসন্ত ঘর কোনটা বা দোকান ঘর। একই ধরনের বহু দোকানে ছেয়ে গেছে বাজার। যদি সুপার মার্কেট জাতীয় কিছু গড়ে ওঠতো, যদি সমবায়িকার মত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বাটা কোম্পানী, সংঘনা ঔষধালয়, ব্যাঙ্ক এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করা যেতো তবে বাজার যেমনি উন্নতমানের হতো, এখানকার মানুষেরও কল্যাণ হতো। কিন্তু তা' হচ্ছেনা।

ফুলিয়া উপনগরীর স্রষ্টা শ্রীযুক্ত এস, কে, দে গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি হয়ে কলকাতায় এলে নদীয়ার জেলাশাসক শ্রীএল, ভি, সপ্তর্ষি তাঁকে ফুলিয়ায় আনার ব্যবস্থা করেন। এবং শ্রীযুক্ত দে গত ১৬/১১/৮২ ফুলিয়ায় এসেছিলেন। তারও প্রায় মাস ৬/৭ আগে এই প্রতিবেদক শ্রীযুক্ত দে কে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর গড়া ফুলিয়ার উন্নতির জন্তে তিনি ঘেন একটু ভাবেন।—কেননা, তাঁর ভাবনা চিন্তার মূলা এখনও যথেষ্ট। তিনি অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর ভাবনা চিন্তা একটি প্রবন্ধাকারে বর্তমান পত্রিকার জন্ম লিখে পাঠান এবং Statesman কাগজেও লিখেন। সে লেখা গত ২২/৮/৮২ প্রকাশিত হয় Statesman পত্রিকায়।

যতদূর খবর রাখি ঐ প্রবন্ধ পড়ে সরকারী মহলে একটু তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নদীয়ার জেলাশাসক পরপর কয়েক দিন আসেন স্থানীয় এডমিনিষ্ট্রেটরের সাথে কথা বলেন, আমাদের সর্বজন প্রদেয় হেডমাষ্টার মহাশয় শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—১০৮

সাহিত্য সৈকত

কথা বলেন ঐযুক্ত দেকে আনার ব্যাপারে। তার কিছুদিন পর গত ৬/১/৮৩ রাজ্যপাল ঐযুক্ত বি, ডি, পাণ্ডেকে ফুলিয়া পরিদর্শন করানো হয়।

ঐযুক্ত দে এবং ঐযুক্ত পাণ্ডেকে ফুলিয়া আনা হয় সরকারী অতিথি হিসাবে। সেখানে সকল নাগরিকের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিলনা। তাঁদের কাউকে সেদিন ফুলিয়ার আসল রূপটা দেখানো হয়নি। ঐযুক্ত দে তো তাঁর ভাষণেই বলেছেন তাঁকে ফুলিয়াটা ঘুরে দেখানো উচিত ছিল। পরে অবশিষ্ট কর্মকর্তারা দেখিয়েছিলেন। আর ঐযুক্ত পাণ্ডেকে দেখানো হয় মুষ্টিমেয় ২/৩টি জায়গা। তাঁর জন্ম ঘর সাজানো হয়েছিল, ফুলের উজ্জান তৈরী করা হয়েছিল, রাস্তার বাম্পার তুলে নেয়া হয়েছিল, রাস্তায় জল ঢালা হয়েছিল, আতিথেয়তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল—এ সবই সরকারী খরচায় ও তত্ত্বাবধানে। ফুলিয়াবাসীকে সেদিন কিছু বলতে দেয়া হয়নি। রাজ্যপালকে ফুলিয়ার ভাল-মন্দ কিছুই জানতে দেয়া হয়নি।

প্রকৃতিদত্ত বৃষ্টি ছাড়া ফুলিয়ার রাস্তা কোন দিন জলে ধোয়া হয়নি ইতিপূর্বে। হাজার মানুষের প্রত্যাশা সত্ত্বেও কাঁচা রাস্তা সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি অঞ্চলে পাকা রাস্তা তৈরী করার কথা ভাবেননি যে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ রাজ্যপাল আসবেন বলে রাতারাতি রাস্তায় ইট পড়লো। হাজার দশেক টাকা খরচা হলো। মাটির রাস্তার ওপর দিয়ে রাজ্যপালের গাড়ী গেলে সম্মানীয় ব্যক্তির অসম্মান হতো কীনা জানিনা কিন্তু একথা ঠিক এ রাস্তা দিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল প্রতিদিন গাড়ী নিয়ে যাবেন না। যারা প্রতিদিন হাঁটবেন তারা দীর্ঘদিন ইটবিহীন ধূলোময়, কাদাময় রাস্তায় পা মাড়িয়েই গেছেন তাদের হাজারো কথা কেউ কর্ণপাত করেন ন। তাদের আবেদন-নিবেদন, পাঁয়ে হাঁটা এই মানুষগুলোর প্রত্যাশার কোন মর্যাদা কেউ দেয়নি। আজ ঐ রাস্তাটা দেখিয়ে কেউ যদি বলেন—যে ভাবেই হোক রাস্তাটা আধাপাকা হলোতো! নিভাস্ত মূর্খেরও বোধ-এর অন্তরে সাহিত্য সৈকন্ত—

অপমানের ধাক্কা এসে বাজবে। সামন্ত যুগ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠবে। সে মনে মনে বলবেই-এ রাস্তা তাদের কথা ভেবে করা হয়নি। করা হয়েছে রাজার তুলাল (!) আসবে বলে।

ফুলিয়া উপনগরীর সমস্তাটা শুধু রাস্তার নয় বাড়ী ঘর দোরের দলিল স্বস্তি বা বন্ধ কারখানা বা হাসপাতাল খোলার মধ্যে নয়।— সমস্তাটা আরও গভীরে—এবং এই গভীরে পৌঁছুতে চাইছেন না কেউ। না প্রশাসন যন্ত্র-না নাগরিকদের প্রতিনিধি স্থানীয়রা।

U. C. R. C. এর স্থানীয় শাখা এ ব্যাপারে নদীয়ার জেলাশাসক, রাজভবনে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের সচিব, রাইটার্সে মুখ্য সচিব, ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী, পুনর্বাসন মন্ত্রী এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রাজ্যপালকে স্মারকলিপিও পাঠিয়েছেন। কিন্তু সরকারী মহল শুধু পাশ কাটিয়ে চলেছেন বলে তাদের ধারণা। এ অবস্থা চলতে থাকলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে এক নেতা জানানেন।

এই সুন্দর পৃথিবীটা আরও বেশী সুন্দর হতো যদি পৃথিবীর সকল সম্পদকে আমরা সুরক্ষা করতে পারতাম। এই পৃথিবীর মানুষগুলো আরও বেশী সৃষ্টিশীল হতে পারতো যদি পৃথিবীর সকল সম্পদের সমবন্টন হতো। কিন্তু আমরা তা করিনা। তা' হতে দিতে চাইনা। যদি সেই মনটা নিয়ে এগোতে পারতাম তা' হলে ফুলিয়া উপনগরী কেন কোন সমস্তাই সমস্তা হয়ে থাকতো না। আমাদের স্বার্থায়েষী মন এবং প্রশাসন কোনটাই ওখানটায় পৌঁছুতে চাইছে না।

“সৈকত—”এর রায়স্বয়ং সংখ্যা—২২ পৃষ্ঠা ১/৮ ডি: চার টা:

গবেষণালব্ধ লেখা রয়েছে ড: সুনীতিকুমার থেকে ইদানীংকালের গবেষক অবধি।

নদীয়া জেলা সংখ্যা—৪৮ পৃ: ১/৮ ডিমাই ২.০০ টা:

নদীয়া জেলাকে জানা যাবে সংক্ষেপে।

প্রয়োজনে ‘সাহিত্য সৈকত’ অফিসে লিখুন।

এক বছরে সাম্প্রতিক ফুলিয়া

অঞ্চল ভিত্তিক লোকসংখ্যা

(১৯৮১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী)

ক) বেলগড়িয়া-১৭৫৭৬ খ) নবলা ১৬৬৮৬

গ) ফুলিয়া উপনগরী ৮১৭১ মোট-৪২৪৩৩ জন

বর্তমানে আনুমানিক ৫০ হাজার। (ব্লক অফিস সূত্রে)

অঞ্চল ভিত্তিক ভূমির পরিমাণ

ক) বেলগড়িয়া—২'০৭ বঃ কিঃ মিঃ খ) নবলা—৭ বঃ মাঃ

গ) ফুলিয়া উপনগরী—৮৪৬ একর মতান্তর ১০৪৭'২৪ একর

মোট ভূমি—আনুমানিক—৩৪২০০'৬৪ বিঘা।

(পঞ্চায়েত অফিস সূত্রে)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ফুলিয়া পলিটেকনিক (আপ গ্রেডেশনের দাবীতে আপাততঃ বন্ধ) ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন (দ্বাদশ ক্লাশ) ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়/ (দশ ক্লাশ)/কুস্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়। এ ছাড়া গ্রাম সেবক-সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

বেলগড়িয়া অঞ্চল—১১টি, নবলা—১৪টি, উপনগরী—৪টি।

লাইব্রেরী

কুস্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা/ফুলিয়া গ্রাম্য পাঠাগার।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

এড মিনিষ্ট্রেশন অফিস/ব্লক অফিস/বেলগড়িয়া, নবলা, টাউনশিপ পঞ্চায়েত অফিস/জেলা বীজ ফার্ম/জেলা ওয়ার্কশপ/ফুলিয়া ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার (৩ বছর ধরে ইনডোর বন্ধ। বর্তমানে আউটডোরও বন্ধ হবার মুখে)/স্টেট ব্যাঙ্ক/টেলিফোন এক্সচেঞ্জ/কোল্ড স্টোরেজ/পশু চিকিৎসালয়/দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র/বিদ্যুৎ অফিস/পোষ্ট অফিস—৫/তন্তবায় সমবায় সমিতি—৪/টাজাইল টেক্সটাইল/অসিকা টেক্সটাইল প্রভৃতি।

সাহিত্য সৈকত—

বিশেষ সংখ্যা—ফুলিয়া—১১১

ক্লাব-সংগঠন

জনরঞ্জন কেন্দ্র/রঞ্জন স্মৃতি সংঘ/জুহুর সংঘ/ফুলিয়া সেবা
সমিতি/বিজয়সংঘ/ভ্রাতৃসংঘ/শিল্পীতীর্থ/কবি কুস্তিবাস সব
পেন্সেঞ্জির আসর/কিশোর সংঘ/সবুজ সংঘ/নবীন সংঘ/ফুলিয়া
যুবগোষ্ঠী/বিবেকামন্দ স্পোর্টিং ক্লাব/জাগরণী সংঘ/নব জাগরণ/
বুইচা যুব সংঘ/পরেশনাথপুর যুবসংঘ/মাঠপাড়া সর্বজনীন
সমিতি/নবকল্যাণ সমিতি/মুন্সেদল/সায়েল ক্লাব/মাতৃসংঘ জন
কল্যাণ সমিতি/কুস্তিবাস ঐথেলিটিক ক্লাব প্রভৃতি।

পত্র পত্রিকা : (ছাপা কাগজ)

ফুলিয়া/*পথ (শিক্ষানিকেতনের মুখপত্র)/সৈকত/
*সাহিত্যসৈকত/স্মরণিকা/শুভম/আজকের সাহিত্য/তত্ত্ববায়/
*টানাপোড়েন (তত্ত্ববায় মুখপত্র)/শব্দের জুঁই।

দেয়াল পত্রিকা : (হাতে লেখা)

বোধন/*শিউলি/*আর্ষভট্ট/*সবুজপাতা/*চৈতন্য।

*চিহ্নের পত্র পত্রিকাগুলোই বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে।

উৎসব অনুষ্ঠান

কুস্তিবাস স্মরণোৎসব/বিজয়া (শারদ) মেলা/
দোল উৎসব ইত্যাদি। —মাঃ ভঃ

পাহাড়ী ষাঁড় এবং অন্যান্য কবিতা - অল্প বসু

সৌমন্ত্র, ৬ সি ফুটলেন, কলিকাতা ৭০০০০৯ দাম—৫ টাকা।

ত্রিপাল্লি কবিতাকে বুক নিয়ে পাহাড়ী ষাঁড় এবং অগ্ন্যাশ্র
কবিতা-র প্রচ্ছদ অনবদ্য হয়েছে ভেতরের ছাপা এবং পরিবেশন
ভঙ্গিও সুন্দর।

পাহাড়ী ষাঁড় নামের পর পর আটটি কবিতা কিছুটা
একঘেয়েমি আনলেও অগ্ন্যাশ্র বেশির ভাগ কবিতার মধ্যে একটা
সবল উদ্বেজনা লক্ষ্য করা যায়—যা মনকে নাড়ায়।

অনুপম সময়ের কাছে - শ্রবীর কুমার দেবনাথ, আশাবরী
পাবলিকেশন ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণলেন, সীত্রাগাছি II. ছাণ্ডা। দাম
১২ টাকা। 'অনুপম সময়ের কাছে' মোট তেরিশটি ছোট কবিতার
সমষ্টি। সব কবিতাগুলি একই মানের না হলেও তবু কিছু
ভালো কবিতা এতে আছে যা পড়তে ভালো লাগে এবং কবিতার
অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। —কাকলি ভট্টাচার্য

ফুলিয়া রেলবাজারের ইতিকথা।

আমরা পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু নিজেদের বাঁচার ভাগিদেই বহু জায়গা ঘুরিয়া কবি কুন্ডিবাসের জন্ম ভিটাতে পুনর্জন্ম লাভের আশায় আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের পেশা ছিল কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা বাণিজ্য। তাই ফুলিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন সাতাশী পাড়া গ্রামে জমিদার উপরেশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু জমি খরিদ করিয়া আস্তানা গড়ে তুলি। বর্তমানে যার নাম পরেশনাথপুর। ইহা আমাদের দেওয়া নাম। কারণ জমিদারের সহৃদয়তার জন্ত তাহার নামে এই গ্রামটির নাম দেওয়া হয় পরেশনাথপুর।

এরপর আসিল আমাদের রুজী রোজগারের চিন্তা ও সমস্যা। স্থানীয় জমিদার তারাশঙ্কর ব্যানার্জী মহাশয়ের কিছু কিছু পতিত জমি এই স্টেশন সংলগ্ন ছিল। জমিদারের অহুমতি লইয়া ছোট ছোট বুঁড়েঘর ও চট টাঙ্গাইয়া অস্থায়ী ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করি।

ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালে গড়িয়া উঠিল ফুলিয়া উপনগরী গড়িয়া উঠিল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জন মানবের সমাবেশ। সুযোগ এল ব্যবসা বাণিজ্যের।

আমাদের এই অস্থায়ী বাজারের পাশেই বর্তমান যে ফুলিয়া রেলবাজার বলিয়া পরিচিত সেই স্থানটি ছিল কলিকাতাস্থিত চারু চন্দ্র ব্যানার্জী জমিদার মহাশয়ের (২ই) আড়াই বিঘা জমির উপর কাছারী বাড়ি।

উক্ত জায়গাটির উপর আমাদের দৃষ্টি আসে। কিভাবে জায়গাটি নেওয়া যায়। ৩২সিক লাল মহাশয়ের পরামর্শে আমি স্বয়ং শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় দুইজন মিলিয়া চারুচন্দ্র স্টেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যামিনী কান্ত মুখার্জীর সহিত বিভিন্ন ভাবে নানান চেষ্টা প্রচেষ্টায় জমি ক্রয়ের স্বীকৃতি লাভ করি, জমিদার মহাশয়ের ভার প্রাপ্ত কর্মচারী ঐ জমির মূল্য আট হাজার টাকা ধার্য্য করেন। পাঁচশত এক টাকা আমাদের দুই জনের

নামে বায়না পত্র করিয়া ছয় মাসের সময় দিয়া একটি রসিদ দিলেন। সমস্তাইল টাকার। কারণ তখন একসঙ্গে কাহারও আট হাজার টাকা দেওয়ার মত সংস্থান ছিল না। তাই ফুলিয়ায় যাহারা প্রথম আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন কাজে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সবাই মিলে দোকান ঘর ও বাজার করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৬ সালে জমি রেজিস্ট্রি করিবার পর যাহারা অংশীদার হইলেন তাহাদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া বাজার করিবার চেষ্টা করা হয় ইহাদের মধ্যে যাহারা ছিলেন তাহারা হইলেন ৩৭সিক লাল সাহা ৩কুসদা প্রসাদ মজুমদার ৩ঘতীন্দ্র মজুমদার ৩বাজেন্দ্র নাথ ভৌমিক, ৩বজেন সরকার ৩নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৩সত্যেন্দ্র নাথ মুখার্জী ৩জুর্গাপ্রসাদ ব্যানার্জী ৩জ্যোতিষ চন্দ্র সাহা, প্রফুল্ল সরকার সর্বস্বতী শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মণীন্দ্র নাথ রায় ও নিবারণ চন্দ্র সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর পরিকল্পনার কোনরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় ৩৭সিক লাল সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে পুনরায় একটি কমিটি গঠন করিয়া বাজারের কার্য শুরু করা হয়।

এই কমিটিতে যাহারা আসিলেন তাহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্ভায় এবং সক্রিয় চিন্তা ভাবনায় ফুলিয়া রেলবাজারের শুভাস্তর ১৯৫৬ সালে। নূতন কমিটিতে যাহারা আসিলেন তাহারা সর্বস্বতী মোহনলাল সরকার, গণেশ চন্দ্র রায়, শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৩৭সিকলাল সাহা, ৩নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ৩সত্যেন্দ্র মুখার্জী ৩জ্যোতিষ চন্দ্র সাহা ও শ্রীনিবারণ সরকার, প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই কমিটি হওয়ার পর বাজারের আড়াই বিঘা জমি ৬৮ জন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করিয়া রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

বাজারের শুভ উদ্বোধন মহাসমারোহে করা হইয়াছিল। উদ্বোধনের দিন স্থানীয় উন্নয়ন অধিকারিক ৩প্রয়াত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য বি, ডি, ও মহাশয় বাজারের নাম দিলেন “ফুলিয়া রেল বাজার তিনি আমাদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তব্য রাখেন এবং সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের আশ্বাস দেন।

এই সভায় বাজার সম্পাদক শ্রীমোহন লাল সরকার সভাপতি প্রয়াত সতেন্দ্র নাথ মুখার্জী ও সহ-সভাপতি শ্রীগণেশ চন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাজার গড়ার বিভিন্ন সমস্যা ও পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত ভাবে সভায় বর্ণনা করেন।

অংশীদারের মধ্যে জমি বন্টনের পর অংশীদারগণ নিজ নিজ বায়ে দোকান ঘর তৈয়ারী করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন বাজারের মধ্যস্থলে সমগ্র অংশীদারের অংশ লইয়া এই বাজার করা হয়। তাহাতে মাছ, মাংস, তরকারী চাউল চিড়া মুড়ী মনোহারী কলের দোকান কাপড়ের দোকান ও নানারকম দ্রব্যের দোকান বসানো হয় এই সমস্ত দোকানদার বাজারের অংশীদার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের জন সাধারণ সবাই উদাস্ত। এই বাজারের ব্যবসার দ্বারা বর্তমানে প্রায় ৩/৪ শত পরিবারের সংসার প্রতিপালন হইতেছে বাজারের আয় হইতে অজাবধি, বাজারের উন্নয়ন মূলক কাজ চলিতেছে।

অংশীদারের অকুপণ উদারতা ত্যাগ ও নিষ্ঠার জন্য এই বাজার উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে বাজারের সীমিত জায়গা বর্তমান উহার এক অংশ দোতলা করা, হইয়াছে, অপর অংশ দোতলা করিবার প্রস্তুতি চলিতেছে।

ইহা অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই বাজার উন্নয়নে কোনরূপ সরকারী, বেসরকারী সাহায্য বা কোনরূপ অনুদান না লইয়া নিজেদের প্রচেষ্টায় এই বাজার গড়া হইয়াছে, এই বাজার দ্বারা, তিনটি অঞ্চলের জনসাধারণ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ উপকৃত হইতেছেন।

আমাদের এই বাজার গড়ার ভূমিকায়, বাজারের অংশীদারগণ, ব্যবসায়ীগণ, এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিটির সভ্যদের অবদান অফুরন্ত, তাহাদের মধ্যে যাহারা সম্পাদকের ভূমিকায় ছিলেন তাহাদের নাম সর্বশ্রী মোহন লাল সরকার, এবং প্রয়াত চন্দ্র ভূষণ মণ্ডল ৬জ্যোতিষ চন্দ্র সাহা, শ্রীউমাকান্ত পাল শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শ্রীযোগেশ চন্দ্র সাহা, শ্রীবাদল চন্দ্র সাহা, এবং শ্রীগিরিনাথ সাহা, প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের বাজারের স্থান সীমিত আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্থানানুসারে ব্যবসায়ীদের এবং সর্বসাধারণকে সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না তরে এবিষয়ে আমরা সজাগ। যতটুকু সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সাহা কিছু করা যায় বাজার কমিটির সদস্যগণ নিরন্তর প্রচেষ্টায় আছেন। এই বাজার তিনটি অংশে বিভক্ত। রেল ষ্টেশনের Rail গেট হইতে যে রাস্তাটি National High Way পর্যন্ত গিয়াছে তার দুইপাশে যে ব্যবসায়ীগণ আছেন ইহা তাদের নিজস্ব ব্যবসা ও সম্পত্তি। অপর অংশ অর্থাৎ মধ্য স্থলটি (৬৮ জম অংশীদারের) ফুলিয়া রেলতহ বাজার। এই দুইটি অংশ লইয়া ফুলিয়া রেলবাজার। অপর অংশ কোঅপারেটিভ মার্কেট। যাহার নাম ফুলিয়া ডেভলপমেন্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। ফুলিয়া উপনগরীর ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। এর উদ্যোক্তা শ্রীবেনী মাধব দে মহাশয় ও অন্যান্য সহকর্মীগণ। উপনগরীর মধ্যস্থলে সরকার কর্তৃক শুধুমাত্র উপনগরীর ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারটি করা হইয়াছিল। উহা ক্রটি পূর্ণ পরিকল্পনা ও সীমাবদ্ধ স্থানে ব্যবসার ব্যবস্থা করায় ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং বাজারটি অচিরে বন্ধ হইয়া যায়। তাহাদের পুনরায় ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই মার্কেটের পুনঃস্থাপ্তি। বর্তমানে বাজারটি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে সর্ব সাধারণকেও ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

রেল তহ বাজার স্থাপ্তি হইতে অত্যাধিক সর্ববিষয়ে ও সর্বসময়ে নিরন্তর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত বাজার উন্নয়নে ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন যারা তারা হলেন প্রয়াত রসিকলাল সাহা, নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সর্বশ্রী মোহনলাল সরকার, গণেশ চন্দ্র রায়, শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, নিবারণ সরকার, মণীন্দ্র নাথ রায়, প্রমোথ ঘোষ যোগেশ চন্দ্র সাহা, বাদল চন্দ্র সাহা, গিরীন্দ্র নাথ সাহা, নিরঞ্জন বিশ্বাস, অনিল বিশ্বাস, কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল ও চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ।

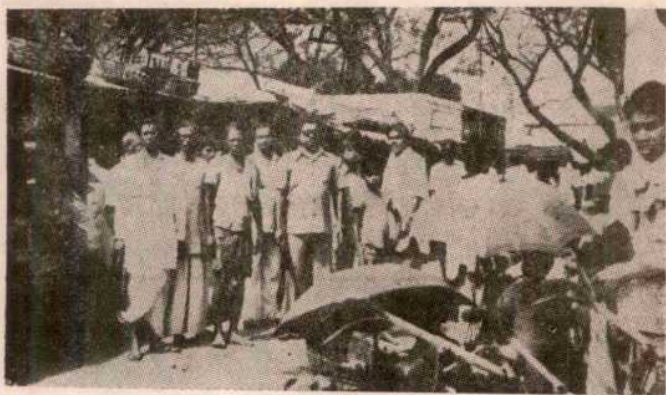
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সাহা, সম্পাদক

শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সহঃ সম্পাদক

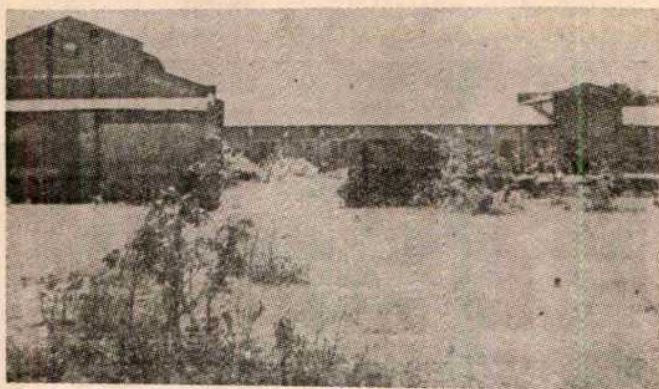
ফুলিয়া রেল তহ বাজার।



ফুলিয়া রেল তহ বাজারের একাংশ



ফুলিয়া কোঃ অপাঃ মার্কেটের একাংশ



উপমে মিলের শেড ।

নীচে মিলের অভ্যন্তরে কর্মরত শ্রমিকেরা ।

টান্কাইল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

অম্বিকা টেক্সটাইল মিলস্ (প্রাঃ) লিঃ

ফুলিয়া, নদীয়া ।

নিউ গণেশ বিল্ডার্স

ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া ।

এখানে ইট, বালি, চূণ, সুরকি, লাল বালি, খোয়া,

কালো ঘাস সুলভে পাওয়া যায় ।

(প্রাঃ) শ্রীসাধন সরকার

*With Best
Compliments Of*

M/s. S. S. INDUSTRIES
ENGINEERS & MANUFACTURERS

Mfg. of : Timber Seasoning Kiln, Timber Treatment Plant,
Vacuum Impregnation Plant, Resin Condensate Plant,
Multiday-Light Hot Press, Baby Boiler, Sterilizer. Oven
Cabinet, Scientific Apparatus & Pipe Line Errection.

City Office : 25, Marquis Street, Calcutta-16

Phone No : 21-2332

**Regd. Office & Works : 8/1, Gurudas Dutta
Garden Lane, Calcutta-700067**

Phone No. : 35-1646

With Compliments Of :

a
Well Wisher

নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রতিবেদন—

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে আমরা নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। জনসাধারণ আমাদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন। আমরা জনসাধারণকে নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—এই যে, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে, সহযোগিতা করে কাজ করব। পরবর্তী কালে সে প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করতে চেষ্টা করেছি।

১। কাঁচা রাস্তা নূতন এবং সংস্কার বাবদ ৪৯৪৫২৫ টি শ্রম দিবস আমরা সৃষ্টি করেছি। মোট ১৮টি রাস্তায় কাজ করান হয়েছে।

২। নূতন নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ৪১টি।

৩। নলকূপ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে ৫৭টি।

৪। নলকূপের সংস্কার করা হয়েছে ৫৫টি।

৫। নলকূপ প্লাটফর্ম করা হয়েছে ২৫টি।

৬। পঞ্চায়েতে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ১টি।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নূতন ঘর তৈরী করা হয়েছে ৯টি।
এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি পুরাতন ঘরই মেরামত করা হয়েছে।

আমরা মনে করি সবচেয়ে বড় কাজ যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে সাধারণের আত্মমর্য্যাদা ও সচেতনতার উদ্বোধন করা।

কালীপদ সরকার

প্রধান

নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত

বেলেঘাট, নদীয়া

With Compliments
from—

**Adhikary
Pharmacy**

A Leading medicine
Shop
Fulia Co-operative
Market, Nadia.

With Compliments of—

**FULIA
RURAL
LIBRARY**

**Space
Donated by—**



**Khoroo
Vaipur Misti**

FULIA RAILBAZAR

With the best
Compliments of—

**APURBA
SAHA**

GOVT. CONTRACTOR &
GENERAL ORDER
SUPPLIERS

Calcutta Office :
36, Vivekananda Park
Calcutta - 41

With the best Compliments of :—

BINAPANI ENGINEERING WORKS

Manufacturer of :—

Grill, Shutter Gate, Collapsible Gate etc.

**6, New Chord Road, Kankinara
24 Parganas.**

With the best
Compliments from :—

Gram—'HILCORD'

Phone No.—KLY. 737

KALYANI RUBBER WORKS

Manufactures of :—FAN BELT,
V-BELTS, HOSES & MOULDED
GOODS.

Supplier to D. G. S. & D.
Defence, Rlys., Coal Field
Authority & Govt. of
West Bengal.

Works—T-15, Industrial
Estate 'D' Block, Kalyani
Nadia (W. B.)

Phone : Ranaghat-177

Shri Binay Bhusan Das

Engineer & Govt.
Contractor.

**PATULI
P.O. RANAGHAT
Dist NADIA.**

আমাদের সকল সহদয় গ্রাহকবৃন্দকে জানাই

আন্তরিক শুভচ্ছা :—

“নারীর সৌন্দর্য্য অলংকারে”

আসুন—

অপকৃপা ডিজাইনের হাফা ছিমছাম অলংকার তৈরারীর
নির্ভরযোগ্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

এ, টি, জুয়েলাস'

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলঘাট, নদীয়া।

(মাছ বাজারের সন্নিকটে)

(প্রাঃ—শৈলেন কুমার কল্লিকার

- ★ জড়োয়া অলংকার তৈরারী আমাদের প্রধান বিশেষত্ব।
- ★ আসল গ্রহরত্নও আমরা অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিঃ দ্রঃ—আমাদের দোকান সোমবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে।

শান্তিপুর কো-অপারেটিভ কোল্ড

ষ্টোরেজ সোসাইটী লিঃ

গ্রাম ও পোঃ বেলেঘাট (ফুলিয়া), জেলা-নদীয়া

শান্তিপুর সমবায় হিমঘর সাক্ষ্যের সঙ্গে বিগত দুই বৎসরের জায় এবংসরেও আলু সংরক্ষণ করছে। ইহা জাতীয় সমবায় বিকাশ নিগম নূতন দিল্লী-এর অর্থানুকূল্যে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় প্রতিষ্ঠান। ইহা মাননীয় সহকারী জেলা-শাসক নদীয়া, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, আই, এ, এমহোদয়ের সভাপতিত্বে পরিচালিত। যে সমস্ত চাষীভা আলু সংরক্ষণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা অবিলম্বে হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আলু ভালভাবে রাখার ব্যাপার হিমঘর কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা নিয়েছে। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এখন আমাদের এই হিমঘরে আলু সংরক্ষণ করে উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে লাভবান হোন।

মনে রাখবেন এ হিমঘর আপনার, আমার, সকলের আপনি হিমঘরের শেয়ার কিনে [প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ (একশত টাকা) ও ভর্তি ফি ৫০০ (পাঁচ টাকা)] একে সদস্য হতে পারেন। আলু সংরক্ষণ ও শেয়ার কেনার বিধি বিবরণের জন্য হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রীদীনবন্ধু পাল।

এক্সিকিউটিভ অফিসার

তাং—বেলেঘাট (ফুলিয়া)

৭/৩/৮০

শান্তিপুর কো-অপারেটিভ

ষ্টোরেজ সোসাইটী লিঃ

আমরাও -

ফুলিয়ার সমৃদ্ধি

কামনা করি ।

যা টাঙ্গাইল আড়া রথন শিল্প
ত লিঃ

ইল তত্ত্বজীবী উন্নয়ন সমবায়
ত লিঃ

বুইচা বসাক পাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া ।

SAHITYA-SAIKAT

Jan-March

Phulia Spl. No.

Rs. 4-

Registered with the Registrar of News Papers for India. Decl. No. 41/13/AL/81 P. Regd.

WB/NDA/ (S)—64

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

শুধু লটারীর চেয়েও একটু বেশী

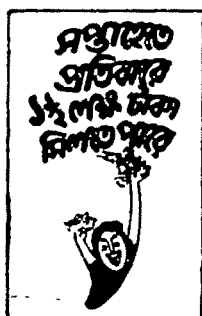
—তাতে নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে উঠছে—

নতুন রাস্তা, নতুন বিদ্যালয়, নতুন হাসপাতাল তৈরী

নতুন নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী শুধু পশ্চিমবাংলা

উন্নতির জন্যে



—লটারী আনে সৌভাগ্যের সম্ভাব—

আপনার ভাগ্য সেরাতে আজই একটি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর টিকিট কিনুন।

(নদীয়া জেলা শাসকের অফিস হইতে প্রচারিত)

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য * প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য

প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, কুলিয়া, বৈষ্ণা, নদীয়া।

মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাকিনাড়া, ২৪ পরগণা।